সপ্তম অধ্যায়

প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে কি শিখেছিল

এই অধ্যায়ে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সহপাঠী দৈত্যবালকদের সংশয় দূর করার জন্য তাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি যখন তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তিনি শ্রীনারদ মুনির শ্রীমুখ থেকে ভাগবত-ধর্মের উপদেশ শ্রবণ করেছিলেন।

হিরণ্যকশিপু যখন তপস্যা করার জন্য মন্দরাচলে গমন করেছিল, তখন দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধে দৈত্যদের পরাজয় হয় এবং তারা চতুর্দিকে পলায়ন করে। হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধু তখন গর্ভবতী ছিল, এবং দেবতারা ভ্রান্তিবশত তার গর্ভস্থ সন্তানকে আরেকটি দৈত্য বলে মনে করে তাকে বন্দী করেছিলেন। দেবতাদের পরিকল্পনা ছিল যে, গর্ভস্থ শিশুটির জন্ম হওয়া মাত্রই তাকে তাঁরা হত্যা করবেন। তাঁরা যখন কয়াধুকে স্বর্গলোকে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নারদ মুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। নারদ মুনি তাঁদের কয়াধুকে এইভাবে নিয়ে যেতে বাধা দেন এবং হিরণ্যকশিপু ফিরে না আসা পর্যন্ত তাকে তাঁর আশ্রমে স্থান দেন। নারদ মুনির আশ্রমে কয়াধু তার গর্ভস্থ শিশুর সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করে। নারদ মুনি তাকে আশ্বাস প্রদান করেন এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপদেশ দেন। প্রহ্লাদ মহারাজ গর্ভস্থ শিশু হওয়া সত্ত্বেও, নারদ মুনির সেই উপদেশ অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেছিলেন। চিন্ময় আত্মা সর্বদাই জড় দেহ থেকে ভিন্ন। জীবের চিন্ময় স্বরূপের কখনও পরিবর্তন হয় না। যে ব্যক্তি দেহাত্মবুদ্ধির অতীত তিনি শুদ্ধ, এবং তিনি দিব্যজ্ঞান লাভের যোগ্য। এই দিব্যজ্ঞান হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি, এবং প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর মাতৃগর্ভে অবস্থান কালে নারদ মুনির কাছে ভগবদ্ভক্তির উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে ব্যক্তি সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত হন তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন, এবং মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে তিনি সমস্ত অবিদ্যা ও জড় বাসনা থেকে পরিত্রাণ লাভ করেন। সকলেরই কর্তব্য ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তার ফলে সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া। জড়-জাগতিক অবস্থা নির্বিশেষে যে কোন মানুষই এই সিদ্ধি লাভ করতে পারে। তপস্যা, যোগ, পুণ্যকর্ম আদি জড়-জাগতিক কার্যকলাপের উপর ভগবদ্ভক্তি নির্ভরশীল নয়। এই সমস্ত সম্পদ ব্যতীতই যে কোন ব্যক্তি শুদ্ধ ভক্তের কৃপার প্রভাবে ভগবদ্ভক্তি লাভ করতে পারেন।

শ্লোক ১

শ্রীনারদ উবাচ

এবং দৈত্যসুতৈঃ পৃষ্টো মহাভাগবতোঽসুরঃ ।
উবাচ তান্ স্ময়মানঃ স্মরন্ মদনুভাষিতম্ ॥ ১ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **দৈত-সুতৈঃ**—দৈত্য-বালকদের দ্বারা; **পৃষ্টঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়ে; **মহা-ভাগবতঃ**—মহান ভগবদ্ভক্ত; **অসুরঃ**—অসুর কুলোদ্ভূত; **উবাচ**—বলেছিলেন; **তান্**—তাদের (দৈত্যবালকদের); **স্ময়মানঃ**—হেসে; **স্মরন্**—স্মরণ করে; **মৎ-অনুভাষিতম্**—আমি যে কথা বলেছিলাম।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—প্রহ্লাদ মহারাজ যদিও অসুরকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তিনি সমস্ত ভক্তদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সহপাঠী অসুর-বালকদের দ্বারা এইভাবে জিজ্ঞাসিত হয়ে, তিনি আমার কথিত উপদেশসমূহ হেসে তাদের বলেছিলেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন তিনি নারদ মুনির বাণী শ্রবণ করেছিলেন। গর্ভস্থ শিশু যে কিভাবে নারদ মুনির বাণী শ্রবণ করেছিলেন তা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, কিন্তু এটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক প্রগতি কোন প্রকার জড় অবস্থার দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না। তাকে বলা হয় *অহৈতুকী অপ্রতিহতা*। দিব্য জ্ঞান গ্রহণ কখনই কোন জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রতিহত হতে পারে না। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর শৈশব কাল থেকেই তাঁর সহপাঠীদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং তারা সকলেই যদিও ছিল শিশু, তবুও তা নিঃসন্দেহে তাদের প্রভাবিত করেছিল।

শ্লোক ২

শ্রীপ্রহ্লাদ উবাচ

পিতরি প্রস্থিতেঽস্মাকং তপসে মন্দরাচলম্ ।
যুদ্ধোদ্যমং পরং চক্রুর্বিবুধা দানবান্ প্রতি ॥ ২ ॥

শ্রী-প্রহ্লাদঃ উবাচ—প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন; **পিতরি**—পিতা হিরণ্যকশিপু; **প্রস্থিতে**—যখন গিয়েছিলেন; **অস্মাকম্**—আমাদের; **তপসে**—তপস্যা করার জন্য; **মন্দর-অচলম্**—মন্দর নামক পর্বতে; **যুদ্ধ-উদ্যমম্**—যুদ্ধ করার উদ্যোগ; **পরম্**—ভীষণ; **চক্রুঃ**—সম্পন্ন করেছিল; **বিবুধাঃ**—ইন্দ্র আদি দেবতাগণ; **দানবান্**—দানবদের; **প্রতি**—প্রতি।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—আমাদের পিতা হিরণ্যকশিপু যখন তপস্যা করার জন্য মন্দর পর্বতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর অনুপস্থিতিতে ইন্দ্র আদি দেবতারা দানবদের দমন করার জন্য এক ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন।

শ্লোক ৩

পিপীলিকৈরহিরিব দিষ্ট্যা লোকোপতাপনঃ ।
পাপেন পাপোঽভক্ষীতি বদন্তো বাসবাদয়ঃ ॥ ৩ ॥

পিপীলিকৈঃ—পিপীলিকার দ্বারা; **অহিঃ**—সর্প; **ইব**—সদৃশ; **দিষ্ট্যা**—আহা; **লোক-উপতাপনঃ**—সর্বদা সকলের উৎপীড়নকারী; **পাপেন**—তার পাপকর্মের ফলে; **পাপঃ**—পাপী হিরণ্যকশিপু; **অভক্ষি**—বিনষ্ট হয়েছে; **ইতি**—এইভাবে; **বদন্তঃ**—বলে; **বাসবাদয়ঃ**—ইন্দ্র আদি দেবতাগণ।

অনুবাদ

"আহা! পিপীলিকা যেমন সর্পকে ভক্ষণ করে, তেমনই সর্বদা সকলের সন্তাপ প্রদানকারী হিরণ্যকশিপুও তার পাপকর্মের ফলে বিনষ্ট হয়েছে।" এই বলে ইন্দ্র আদি দেবতারা দৈত্যদের সঙ্গে যুদ্ধের আয়োজন করেছিলেন।

শ্লোক ৪-৫

তেষামতিবলোদ্‌যোগং নিশম্যাসুরযূথপাঃ ।
বধ্যমানাঃ সুরৈর্ভীতা দুদ্রুবুঃ সর্বতোদিশম্ ॥ ৪ ॥
কলত্রপুত্রবিত্তাপ্তান্ গৃহান্ পশুপরিচ্ছদান্ ।
নাবেক্ষ্যমাণাস্ত্বরিতাঃ সর্বে প্রাণপরীপ্সবঃ ॥ ৫ ॥

তেষাম্—ইন্দ্র আদি দেবতাদের; **অতিবল-উদ্‌যোগম্**—অত্যন্ত উদ্যোগ এবং বল; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **অসুর-যূথপাঃ**—অসুরদের মহান নেতাগণ; **বধ্যমানাঃ**—একে একে নিহত হয়ে; **সুরৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **ভীতাঃ**—ভয়ভীত; **দুদ্রুবুঃ**—পলায়ন করেছিল; **সর্বতঃ**—সর্ব; **দিশম্**—দিকে; **কলত্র**—পত্নীগণ; **পুত্র-বিত্ত**—সন্তান এবং সম্পত্তি; **আপ্তান্**—আত্মীয়স্বজন; **গৃহান্**—গৃহ; **পশু-পরিচ্ছদান্**—পশু এবং গৃহস্থালির সামগ্রী; **ন**—না; **অবেক্ষ্যমাণাঃ**—দৃষ্টিপাত; **ত্বরিতাঃ**—অত্যন্ত দ্রুত; **সর্বে**—তারা সকলে; **প্রাণ-পরীপ্সবঃ**—প্রাণ রক্ষার জন্য।

অনুবাদ

অসুর যূথপতিরা যখন যুদ্ধে একে একে দেবতাদের হস্তে নিহত হতে লাগল, তখন অন্য অসুরেরা নানাদিকে পলায়ন করতে শুরু করল। তাদের প্রাণ রক্ষার জন্য তারা এতই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল যে, তারা তাদের গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, পশু এবং গৃহের উপকরণের প্রতি দৃষ্টিপাতও করতে পারেনি।

শ্লোক ৬

ব্যলুম্পন্ রাজশিবিরমমরা জয়কাঙ্ক্ষিণঃ ।
ইন্দ্রস্তু রাজমহিষীং মাতরং মম চাগ্রহীৎ ॥ ৬ ॥

ব্যলুম্পন্—অপহরণ করেছিল; **রাজ-শিবিরম্**—আমার পিতা হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ; **অমরাঃ**—দেবতাগণ; **জয়-কাঙ্ক্ষিণঃ**—জয় লাভের আকাঙ্ক্ষায়; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **তু**—কিন্তু; **রাজ-মহিষীম্**—রাজমহিষী; **মাতরম্**—মাতাকে; **মম**—আমার; **চ**—ও; **অগ্রহীৎ**—বন্দী করেছিলেন।

অনুবাদ

বিজয়ী দেবতারা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রাসাদ লুণ্ঠন করেছিলেন এবং সেখানকার সব কিছু বিনষ্ট করেছিলেন। তারপর দেবরাজ ইন্দ্র আমার মাতা দৈত্য-রাজমহিষীকে বন্দী করেছিলেন।

শ্লোক ৭

নীয়মানাং ভয়োদ্বিগ্নাং রুদতীং কুররীমিব ।
যদৃচ্ছয়াগতস্তত্র দেবর্ষির্দদৃশে পথি ॥ ৭ ॥

নীয়মানাম্—নিয়ে যাচ্ছিলেন; **ভয়-উদ্বিগ্নাম্**—উদ্বিগ্ন এবং ভয়ে ভীত; **রুদতীম্**—ক্রন্দন করে; **কুররীম্ ইব**—কুররী পক্ষীর মতো; **যদৃচ্ছয়া**—ঘটনাক্রমে; **আগতঃ**—উপস্থিত; **তত্র**—সেই স্থানে; **দেব-ঋষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **দদৃশে**—দেখেছিলেন; **পথি**—পথে।

অনুবাদ

শকুনের কবলগ্রস্ত কুররী পক্ষীর মতো ক্রন্দন-পরায়ণা আমার মাকে যখন তাঁরা নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে নারদ মুনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং সেই অবস্থায় আমার মাকে দর্শন করেছিলেন।

শ্লোক ৮

প্রাহ নৈনাং সুরপতে নেতুমর্হস্যনাগসম্ ।
মুঞ্চ মুঞ্চ মহাভাগ সতীং পরপরিগ্রহম্ ॥ ৮ ॥

প্রাহ—তিনি বলেছিলেন; **ন**—না; **এনাম্**—এই; **সুরপতে**—হে দেবরাজ; **নেতুম্**—টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া; **অর্হসি**—উচিত; **অনাগসম্**—নিষ্পাপ; **মুঞ্চ মুঞ্চ**—মুক্ত কর, মুক্ত কর; **মহাভাগ**—হে পরম ভাগ্যবান; **সতীম্**—সতী; **পর-পরিগ্রহম্**—পর-পুরুষের পত্নীকে।

অনুবাদ

নারদ মুনি বললেন—হে দেবরাজ ইন্দ্র, এই নিষ্পাপ রমণীকে এই রকম নিষ্ঠুরভাবে নিয়ে যাওয়া তোমার উচিত নয়। হে মহাভাগ্যবান, এই সতী অন্যের স্ত্রী, একে তুমি এখনই মুক্ত কর, মুক্ত কর।

শ্লোক ৯

শ্রীইন্দ্র উবাচ

আস্তেঽস্যা জঠরে বীর্যমবিষহ্যং সুরদ্বিষঃ ।
আস্যতাং যাবৎ প্রসবং মোক্ষ্যেঽর্থপদবীং গতঃ ॥ ৯ ॥

শ্রী-ইন্দ্রঃ উবাচ—দেবরাজ ইন্দ্র বললেন; **আস্তে**—আছে; **অস্যাঃ**—তার; **জঠরে**—গর্ভে; **বীর্যম্**—বীজ; **অবিষহ্যম্**—দুঃসহ; **সুর-দ্বিষঃ**—দেবতাদের শত্রুর; **আস্যতাম্**—

সে থাকুক (আমাদের কারাগারে); **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **প্রসবম্**—শিশুটির প্রসব; **মোক্ষ্যে**—মুক্ত করব; **অর্থ-পদবীম্**—আমার উদ্দেশ্য; **গতঃ**—লাভ হলে।

অনুবাদ

দেবরাজ ইন্দ্র বললেন—এই দানবপত্নীর গর্ভে সেই মহাদৈত্য হিরণ্যকশিপুর বীজ রয়েছে। তাই যতদিন না প্রসব হয়, ততদিন আমি একে আমার তত্ত্বাবধানে রাখব, তারপর পুত্রের জন্ম হলে একে মুক্ত করব।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র প্রহ্লাদ মহারাজের মাতাকে বন্দী করতে মনস্থ করেছিলেন কারণ তিনি মনে করেছিলেন যে, তার গর্ভে হিরণ্যকশিপুর মতো আরেকটি দৈত্য রয়েছে। তাই তিনি মনে করেছিলেন যে, শিশুটির জন্মের পর তাকে হত্যা করে তারপর অসুরপত্নীকে মুক্ত করাই সমীচীন হবে।

শ্লোক ১০

শ্রীনারদ উবাচ

অয়ং নিষ্কিল্বিষঃ সাক্ষান্মহাভাগবতো মহান্ ।
ত্বয়া ন প্রাপ্স্যতে সংস্থামনন্তানুচরো বলী ॥ ১০ ॥

শ্রী-নারদঃ উবাচ—দেবর্ষি নারদ মুনি বললেন; **অয়ম্**—এই (গর্ভস্থ শিশুটি); **নিষ্কিল্বিষঃ**—সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **মহা-ভাগবতঃ**—একজন মহাভাগবত; **মহান্**—মহান; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **ন**—না; **প্রাপ্স্যতে**—প্রাপ্ত হবে; **সংস্থাম্**—তার মৃত্যু; **অনন্ত**—ভগবানের; **অনুচরঃ**—সেবক; **বলী**—অত্যন্ত শক্তিশালী।

অনুবাদ

নারদ মুনি উত্তর দিলেন—এই রমণীর গর্ভস্থ শিশুটি নির্দোষ এবং নিষ্পাপ। প্রকৃতপক্ষে সে একজন মহাভাগবত, ভগবানের এক মহা প্রভাবসম্পন্ন অনুচর। তাই তুমি একে বধ করতে পারবে না।

তাৎপর্য

অনেক সময় অসুর অথবা অভক্তদের ভক্তকে হত্যা করার চেষ্টা করতে দেখা গেছে, কিন্তু মহান ভগবদ্ভক্তকে তারা বিনাশ করতে সক্ষম হয়নি। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩১) ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি*। এইভাবে ভগবান ঘোষণা করেছেন যে, অসুরেরা কখনই তাঁর ভক্তকে হত্যা করতে পারবে না। প্রহ্লাদ মহারাজ হচ্ছেন ভগবানের এই প্রতিজ্ঞার সত্যতার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নারদ মুনি ইন্দ্রকে বলেছিলেন, "তোমরা দেবতা হলেও এই শিশুটিকে হত্যা করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব, এবং অন্যদের পক্ষেও তা অবশ্যই অসম্ভব।"

শ্লোক ১১

ইত্যুক্তস্তাং বিহায়েন্দ্রো দেবর্ষের্মানয়ন্ বচঃ ।
অনন্তপ্রিয়ভক্ত্যৈনাং পরিক্রম্য দিবং যযৌ ॥ ১১ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্তঃ**—সম্বোধিত হয়ে; **তাম্**—তাকে; **বিহায়**—মুক্ত করে; **ইন্দ্রঃ**—দেবরাজ ইন্দ্র; **দেবর্ষেঃ**—নারদ মুনির; **মানয়ন্**—সম্মান করে; **বচঃ**—বাণী; **অনন্ত-প্রিয়**—ভগবানের প্রিয়; **ভক্ত্যা**—ভক্তি সহকারে; **এনাম্**—এই (স্ত্রীকে); **পরিক্রম্য**—প্রদক্ষিণ করে; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **যযৌ**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদ এইভাবে বললে, দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বাক্য অনুসারে তৎক্ষণাৎ আমার মাতাকে মুক্ত করেছিলেন। আমি ভগবানের ভক্ত বলে সমস্ত দেবতারা তখন আমার মাকে প্রদক্ষিণ করেছিলেন, এবং তারপর তাঁরা স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

দেবরাজ ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা যদিও এক একজন মহাপুরুষ, তবুও তাঁরা নারদ মুনির এত বাধ্য ছিলেন যে, প্রহ্লাদ মহারাজের সম্বন্ধে নারদ মুনির উক্তি শ্রবণ করা মাত্রই ইন্দ্র তা স্বীকার করেছিলেন। একেই বলে পরম্পরার ধারায় জ্ঞান লাভ করা। ইন্দ্র এবং দেবতারা জানতেন না যে, হিরণ্যকশিপুর পত্নী কয়াধুর গর্ভে এক মহান ভক্ত রয়েছেন, কিন্তু নারদ মুনির উক্তি শ্রবণ করা মাত্রই তাঁরা তা মেনে নিয়েছিলেন এবং যে মাতার গর্ভে তিনি বাস করছিলেন, তাঁকে প্রদক্ষিণ

করে, তৎক্ষণাৎ সেই ভক্তের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। পরম্পরার মাধ্যমে ভগবান এবং তাঁর ভক্তকে জানাই হচ্ছে জ্ঞান লাভের পন্থা। ভগবান এবং তাঁর ভক্ত সম্বন্ধে কোন রকম জল্পনা-কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না। মানুষের কর্তব্য শুদ্ধ ভক্তের বাণী স্বীকার করা এবং তা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করা।

শ্লোক ১২

ততো মে মাতরমৃষিঃ সমানীয় নিজাশ্রমে ।
আশ্বাস্যেহোষ্যতাং বৎসে যাবৎ তে ভর্তুরাগমঃ ॥ ১২ ॥

ততঃ—তারপর; **মে**—আমার; **মাতরম্**—মাতাকে; **ঋষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **সমানীয়**—নিয়ে এসে; **নিজ-আশ্রমে**—তাঁর আশ্রমে; **আশ্বাস্য**—তাকে আশ্বাস প্রদান করে; **ইহ**—এখানে; **উষ্যতাম্**—থাক; **বৎসে**—হে প্রিয় কন্যা; **যাবৎ**—যতদিন; **তে**—তোমার; **ভর্তুঃ**—পতির; **আগমঃ**—ফিরে আসে।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—দেবর্ষি নারদ আমার মাতাকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এসেছিলেন এবং তাঁকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেছিলেন, "হে বৎসে, তোমার পতি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি আমার আশ্রমে থাক।"

শ্লোক ১৩

তথেত্যবাৎসীদ্ দেবর্ষেরন্তিকে সাকুতোভয়া ।
যাবদ্ দৈত্যপতির্ঘোরাৎ তপসো ন ন্যবর্তত ॥ ১৩ ॥

তথা—তাই হোক; **ইতি**—এইভাবে; **অবাৎসীৎ**—বাস করেছিলেন; **দেবর্ষেঃ**—দেবর্ষি নারদের; **অন্তিকে**—নিকটে; **সা**—তিনি (আমার মাতা); **অকুতোভয়া**—সর্বতোভাবে নির্ভয় হয়ে; **যাবৎ**—যতক্ষণ পর্যন্ত; **দৈত্যপতিঃ**—আমার পিতা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপু; **ঘোরাৎ**—কঠোর; **তপসঃ**—তপস্যা থেকে; **ন**—না; **ন্যবর্তত**—নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

দেবর্ষি নারদের উপদেশ অঙ্গীকার করে আমার মাতা সর্বতোভাবে ভয়মুক্ত হয়ে, আমার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁর কঠোর তপস্যা থেকে নিবৃত্ত হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত, তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন।

শ্লোক ১৪

ঋষিং পর্যচরৎ তত্র ভক্ত্যা পরময়া সতী ।
অন্তর্বত্নী স্বগর্ভস্য ক্ষেমায়েচ্ছাপ্রসূতয়ে ॥ ১৪ ॥

ঋষিম্—নারদ মুনিকে; **পর্যচরৎ**—সেবা করেছিলেন; **তত্র**—সেখানে (নারদ মুনির আশ্রমে); **ভক্ত্যা**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **পরময়া**—পরম; **সতী**—সতী; **অন্তর্বত্নী**—গর্ভবতী; **স্ব-গর্ভস্য**—তাঁর গর্ভের; **ক্ষেমায়**—মঙ্গলের জন্য; **ইচ্ছা**—ইচ্ছা অনুসারে; **প্রসূতয়ে**—সন্তান প্রসব করার জন্য।

অনুবাদ

গর্ভবতী সতী আমার মাতা তাঁর গর্ভের মঙ্গল কামনা করে তাঁর পতির আগমনের পর প্রসব করার বাসনা করেছিলেন। এইভাবে তিনি পরম ভক্তি সহকারে নারদ মুনির সেবা করে তাঁর আশ্রমে অবস্থান করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (৯/১৯/১৭) উল্লেখ করা হয়েছে—

মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥

নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীর সঙ্গে, এমন কি নিজের মা, ভগ্নী অথবা কন্যার সঙ্গেও থাকা উচিত নয়। যদিও নির্জন স্থানে কোন স্ত্রীর সঙ্গে থাকতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে, তবুও নারদ মুনি প্রহ্লাদ মহারাজের যুবতী মাতাকে আশ্রয় প্রদান করেছিলেন, যিনি গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে নারদ মুনির সেবা করেছিলেন। তার অর্থ কি এই যে নারদ মুনি বৈদিক নির্দেশ লঙ্ঘন করেছিলেন? অবশ্যই নয়। এই প্রকার নির্দেশ বদ্ধ জীবদের জন্য, কিন্তু নারদ মুনি হচ্ছেন মুক্ত পুরুষ। নারদ মুনি চিন্ময় স্তরে অবস্থিত একজন মহান ঋষি। তাই, যদিও তিনি ছিলেন

একজন যুবক পুরুষ, তবুও তিনি একজন যুবতী রমণীকে আশ্রয় প্রদান করে তাঁর সেবা গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও এক পরমা সুন্দরী বেশ্যার সঙ্গে গভীর রাত্রে কথা বলেছিলেন, কিন্তু সেই রমণী তাঁর চিত্ত বিচলিত করতে পারেনি। পক্ষান্তরে সে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের আশীর্বাদে এক শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবীতে পরিণত হয়েছিল। সাধারণ মানুষের কিন্তু এই প্রকার মহা-ভাগবতদের আচরণের অনুকরণ করা উচিত নয়। সাধারণ মানুষের কর্তব্য স্ত্রীসঙ্গ থেকে দূরে থেকে শাস্ত্রের নির্দেশ কঠোর নিষ্ঠা সহকারে পালন করা। নারদ মুনি অথবা হরিদাস ঠাকুরের আচরণ অনুকরণ করা কখনই উচিত নয়। বলা হয়েছে, *বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়।* যে কোন ব্যক্তি নির্ভয়ে শুদ্ধ বৈষ্ণবের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। তাই পূর্ববর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, *দেবর্ষেরন্তিকে সাকুতোভয়া*—প্রহ্লাদ মহারাজের মাতা কয়াধু সর্বতোভাবে ভয়মুক্ত হয়ে নারদ মুনির রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন। তেমনই, নারদ মুনি তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে, নির্ভয়ে একজন যুবতী রমণীর সঙ্গে ছিলেন। নারদ মুনি, হরিদাস ঠাকুর প্রমুখ আচার্যেরা, যাঁরা ভগবানের মহিমা প্রচার করার জন্য বিশেষ শক্তির দ্বারা আবিষ্ট, তাঁরা কখনও জড়-জাগতিক স্তরে অধঃপতিত হন না। তাই আচার্যকে একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে (*গুরুষু নরমতিঃ*)।

শ্লোক ১৫

ঋষিঃ কারুণিকস্তস্যাঃ প্রাদাদুভয়মীশ্বরঃ ।
ধর্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানং চ মামপ্যুদ্দিশ্য নির্মলম্ ॥ ১৫ ॥

ঋষিঃ—দেবর্ষি নারদ; **কারুণিকঃ**—স্বভাবতই অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ এবং কৃপালু; **তস্যাঃ**—তাঁকে; **প্রাদাৎ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **উভয়ম্**—উভয়; **ঈশ্বরঃ**—ইচ্ছা অনুসারে আচরণ করতে সমর্থ ব্যক্তি (নারদ মুনি); **ধর্মস্য**—ধর্মের; **তত্ত্বম্**—তত্ত্ব; **জ্ঞানম্**—জ্ঞান; **চ**—এবং; **মাম্**—আমাকে; **অপি**—বিশেষ করে; **উদ্দিশ্য**—উদ্দেশ করে; **নির্মলম্**—জড় কলুষবিহীন।

অনুবাদ

নারদ মুনি গর্ভস্থ আমি এবং পরিচর্যারত আমার মাতা উভয়কেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন। যেহেতু তিনি স্বভাবতই অধঃপতিত জীবদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু,

তাই তাঁর চিন্ময় স্থিতিতে অবস্থিত হয়ে তিনি ধর্মতত্ত্ব এবং দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেই উপদেশ সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত ছিল।

তাৎপর্য

এখানে বলা হয়েছে, *ধর্মস্য তত্ত্বং জ্ঞানং চ.....নির্মলম্।* *নির্মলম্* শব্দের অর্থ অমল ধর্ম বা ভাগবত-ধর্ম। সাধারণ ধর্ম অনুষ্ঠান সমল ধর্ম, যার ফলে জড়-জাগতিক ধন-সম্পদ এবং উন্নতি সাধন হয়, কিন্তু নির্মল বিশুদ্ধ ধর্ম হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্ক সম্বন্ধে অবগত হয়ে সেই অনুসারে আচরণ করা। তার ফলে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পরম উদ্দেশ্য সাধিত হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ উপদেশ দিয়েছেন যে, জীবনের শুরু থেকেই ভাগবত-ধর্মের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত (*কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ*)। ভগবান স্বয়ং সেই নির্মল ধর্মের উপদেশ দিয়েছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"বিভিন্ন প্রকার সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬) মানুষের কর্তব্য ভগবানের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে সেই অনুসারে আচরণ করা। সেটিই ভাগবত-ধর্ম। ভাগবত-ধর্মের অর্থ হচ্ছে ভক্তিযোগ।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং চ যদহৈতুকম্ ॥

"ভক্তি সহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করা হলে অচিরেই শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হয় এবং জড়-জাগতিক বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি আসে।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৭) বিশুদ্ধ ধর্মের স্তরে অধিষ্ঠিত হতে হলে, বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ভক্তিযোগের অনুশীলন করতে হয়।

শ্লোক ১৬

তত্তু কালস্য দীর্ঘত্বাৎ স্ত্রীত্বান্মাতুস্তিরোদধে ।
ঋষিণানুগৃহীতং মাং নাধুনাপ্যজহাৎ স্মৃতিঃ ॥ ১৬ ॥

তৎ—সেই (ধর্ম এবং জ্ঞান বিষয়ক উপদেশ); **তু**—বস্তুতপক্ষে; **কালস্য**—কালের; **দীর্ঘত্বাৎ**—দীর্ঘত্বহেতু; **স্ত্রীত্বাৎ**—স্ত্রীজাতি বলে; **মাতুঃ**—আমার মাতা; **তিরোদধে**—লুপ্ত হয়েছে; **ঋষিণা**—ঋষির দ্বারা; **অনুগৃহীতম্**—অনুগৃহীত হওয়ার ফলে; **মাম্**—আমাকে; **ন**—না; **অধুনা**—আজ; **অপি**—ও; **অজহাৎ**—ত্যাগ করেছে; **স্মৃতিঃ**—স্মৃতি (নারদ মুনির উপদেশের)।

অনুবাদ

দীর্ঘকাল গত হওয়ায় এবং স্ত্রীজাতি বলে আমার মা সেই সমস্ত উপদেশ বিস্মৃত হয়েছেন; কিন্তু দেবর্ষি নারদের অনুগ্রহে আমি তা ভুলিনি।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) ভগবান বলেছেন—

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

"হে পার্থ, অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীলোকেরা, তথা বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি নিচ বর্ণস্থ মানুষেরাও আমার অনন্য ভক্তিকে বিশেষভাবে আশ্রয় করে অবিলম্বে পরাগতি লাভ করে।" *পাপযোনি* শব্দে তাদের ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা শূদ্রদের থেকেও নিচ। কিন্তু স্ত্রীলোকেরা পাপযোনি না হলেও, অল্পবুদ্ধি হওয়ার ফলে কখনও কখনও ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশ বিস্মৃত হয়। কিন্তু যারা যথেষ্ট শক্তিশালিনী, তাদের ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। স্ত্রীলোকেরা সাধারণত জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত, এবং তার ফলে তাদের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় উপদেশ ভুলে যাওয়ার প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীলোকেরাও যদি নিষ্ঠাপূর্বক শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অনুসারে ভগবদ্ভক্তির অনুসরণ করে, তা হলে ভগবান বলেছেন যে, তারাও ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে (*তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্*), এবং তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। মানুষের কর্তব্য ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে, নিষ্ঠা সহকারে বিধি-নিষেধগুলি পালন করা। তা হলে, তিনি যেই হোন না কেন, তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মাতা তাঁর গর্ভস্থ শিশুকে রক্ষা করার ব্যাপারে অধিক চিন্তিত ছিলেন এবং তাঁর পতির প্রত্যাবর্তনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তাই তিনি নারদ মুনির জ্ঞানগর্ভ উপদেশ গভীরভাবে বিচার করতে পারেননি।

শ্লোক ১৭

ভবতামপি ভূয়ান্মে যদি শ্রদ্দধতে বচঃ ।
বৈশারদী ধীঃ শ্রদ্ধাতঃ স্ত্রীবালানাং চ মে যথা ॥ ১৭ ॥

ভবতাম্—তোমাদের; **অপি**—ও; **ভূয়াৎ**—হতে পারে; **মে**—আমার; **যদি**—যদি; **শ্রদ্দধতে**—বিশ্বাস কর; **বচঃ**—বাক্যে; **বৈশারদী**—অত্যন্ত দক্ষ, অথবা ভগবান

সম্পর্কে; **ধীঃ**—বুদ্ধি; **শ্রদ্ধাতঃ**—দৃঢ় শ্রদ্ধার ফলে; **স্ত্রী**—স্ত্রীলোকদের; **বালানাম্**—বালকদের; **চ**—ও; **মে**—আমার; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

প্রহ্লাদ মহারাজ বললেন—হে বন্ধুগণ, তোমরা যদি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান হও, তা হলে কেবল সেই শ্রদ্ধার ফলে তোমরাও ছোট্ট বালক হওয়া সত্ত্বেও, আমার মতো এই দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। তেমনই, স্ত্রীলোকেরাও এই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করে জানতে পারবেন আত্মা কি এবং জড় পদার্থ কি।

তাৎপর্য

পরম্পরার ধারায় প্রবাহিত জ্ঞানের প্রসঙ্গে প্রহ্লাদ মহারাজের এই বাণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর জন্মের পূর্বে মায়ের গর্ভে অবস্থান কালেই নারদ মুনির বীর্যবতী উপদেশের ফলে পরম শক্তির অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলেন, এবং ভক্তিযোগের মাধ্যমে কিভাবে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করতে হয় তা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিষয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি।

যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"যে সমস্ত মহাত্মাগণ ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, সমস্ত বৈদিক জ্ঞান তাঁদের কাছে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/২৩)

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্‌গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ ॥

"কেউই তার স্থূল জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পারে না। কিন্তু ভগবান যখন তাঁর ভক্তের প্রেমময়ী সেবার ফলে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হন, তখন তাঁর কাছে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন।" (*ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* ১/২/২৩৪)

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥

"কেবল ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার ভক্তির দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানকে যথাযথভাবে জানার ফলে ভগবদ্ধামে প্রবেশ করা যায়।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৫৫)

এইগুলি বৈদিক নির্দেশ। মানুষের কর্তব্য শ্রীগুরুদেবের বাণীতে পূর্ণ শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া এবং ভগবানের প্রতিও এইভাবে শ্রদ্ধাপরায়ণ হওয়া। তখন আত্মা ও পরমাত্মার প্রকৃত জ্ঞান, এবং জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য আপনা থেকেই প্রকাশিত হবে। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো মহাজনের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করেন বলে, ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে এই আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

এই শ্লোকে *ভূয়াৎ* শব্দটির অর্থ 'হোক'। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর সহপাঠীদের তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করে বলেছিলেন, "তোমরাও আমার মতো শ্রদ্ধাবান হও। যথার্থ বৈষ্ণব হও।" ভগবদ্ভক্ত চান যে সকলেই যেন কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করে। কিন্তু, দুর্ভাগ্যবশত, মানুষেরা প্রায়ই গুরু পরম্পরার ধারায় আগত শ্রীগুরুদেবের বাণীতে দৃঢ় শ্রদ্ধাপরায়ণ হয় না, এবং তার ফলে তারা দিব্যজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। সদ্‌গুরুকে অবশ্যই প্রামাণিক গুরু-পরম্পরার অন্তর্গত হতে হবে, যেমন প্রহ্লাদ মহারাজ নারদ মুনির কাছে এই দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন। প্রহ্লাদ মহারাজের সহপাঠী অসুর-বালকেরা যদি প্রহ্লাদ মহারাজের কাছ থেকে সেই সত্য গ্রহণ করত, তা হলে তারাও নিশ্চিতভাবে পূর্ণ দিব্যজ্ঞান লাভ করতে পারত।

বৈশারদী ধীঃ শব্দ দুটি পরম দক্ষ পরমেশ্বর ভগবান বিষয়ক বুদ্ধি বোঝায়। ভগবান তাঁর অত্যন্ত দক্ষ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা এই অপূর্ব সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন। অত্যন্ত দক্ষ না হলে, পরম দক্ষের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনা হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। কিন্তু কেউ যখন তাঁর পরম সৌভাগ্যের ফলে ব্রহ্মা, শিব, লক্ষ্মী অথবা কুমারদের পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য লাভ করেন, তখন তিনি এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। এই চারটি সম্প্রদায়কে বলা হয় ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, রুদ্র-সম্প্রদায়, শ্রী-সম্প্রদায় এবং কুমার-সম্প্রদায়। *সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।* এই সম্প্রদায়গুলির কোন একটির মাধ্যমে পরম্পরার ধারায় ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভের ফলে চিন্ময় দর্শন লাভ হয়। পরম্পরার ধারা অনুসরণ না করলে ভগবানকে জানা সম্ভব হয় না। কেউ যদি পরম্পরার প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হয়ে, ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে জানতে পারেন এবং ভগবদ্ভক্তির মার্গে অগ্রসর হতে থাকেন, তা হলে তাঁর স্বাভাবিক ভগবৎ-প্রেম জাগরিত হবে, এবং তার ফলে তাঁর জীবন নিঃসন্দেহে সার্থক হবে।

শ্লোক ১৮

জন্মাদ্যাঃ ষড়িমে ভাবা দৃষ্টা দেহস্য নাত্মনঃ ।
ফলানামিব বৃক্ষস্য কালেনেশ্বরমূর্তিনা ॥ ১৮ ॥

জন্ম-আদ্যাঃ—জন্ম থেকে শুরু করে; **ষট্**—ছয় (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং চরমে মৃত্যু); **ইমে**—এই সমস্ত; **ভাবাঃ**—শরীরের বিভিন্ন অবস্থা; **দৃষ্টাঃ**—দর্শন করে; **দেহস্য**—দেহের; **ন**—না; **আত্মনঃ**—আত্মার; **ফলানাম্**—ফলের; **ইব**—সদৃশ; **বৃক্ষস্য**—বৃক্ষের; **কালেন**—যথাসময়ে; **ঈশ্বর-মূর্তিনা**—যাঁর রূপ হচ্ছে শরীরের কার্যকলাপের রূপান্তর করা অথবা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা।

অনুবাদ

বৃক্ষের ফল এবং ফুলের যেমন কালবশত ছয় প্রকার বিকার (জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং মৃত্যু) হয়, তেমনই জীবাত্মার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রাপ্ত জড় দেহেরও এই প্রকার পরিবর্তন হয়। কিন্তু আত্মার কোন পরিবর্তন হয় না।

তাৎপর্য

চিন্ময় আত্মা এবং জড় দেহের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গমের বিষয়ে এই শ্লোকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আত্মা নিত্য। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (২/২০) বলা হয়েছে—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥

"আত্মার কখনও জন্ম হয় না বা মৃত্যু হয় না। অথবা পুনঃ পুনঃ তাঁর উৎপত্তি বা বৃদ্ধি হয় না; আত্মা জন্মরহিত, শাশ্বত, নিত্য এবং নবীন। শরীর নষ্ট হলেও আত্মা কখন বিনষ্ট হয় না।" ক্ষয় এবং পরিবর্তন থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে আত্মা নিত্য । এই ক্ষয় এবং পরিবর্তন হয় জড় দেহের। এই সম্পর্কে বৃক্ষ, তার ফল এবং ফুলের দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত সহজ এবং স্পষ্ট। একটি বৃক্ষ বহু বহু বছর দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু ঋতুর পরিবর্তনে তার ফল এবং ফুলের ছয়টি পরিবর্তন হয়। আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিকেরা দাবি করছে যে, রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ার ফলে তারা জীবনের সৃষ্টি করবে, কিন্তু তাদের এই মতবাদটি নিতান্তই বোকামি এবং একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। মানুষের জড় দেহের জন্ম হয় ভ্রূণকোষ এবং বীর্যের মিশ্রণের ফলে, কিন্তু জন্মের ইতিহাস হচ্ছে যে, মৈথুনের পর ভ্রূণকোষ এবং বীর্যের মিশ্রণ হলেও সব সময় গর্ভ ধারণ হয় না। সেই মিশ্রণে যদি আত্মা প্রবেশ না করে, তা হলে গর্ভ ধারণের কোন সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু যখন আত্মা সেই মিশ্রণে আশ্রয় গ্রহণ করে তখন দেহের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, রূপান্তর ও ক্ষয় হয়, এবং

অবশেষে দেহের বিনাশ হয়। ঋতু অনুসারে বৃক্ষের ফল এবং ফুল আসে যায়, কিন্তু বৃক্ষটি দাঁড়িয়ে থাকে। তেমনই, দেহান্তরশীল আত্মা বিভিন্ন প্রকার দেহ ধারণ করে, যেগুলির ছয় প্রকার বিকার হয়, কিন্তু আত্মা অপরিবর্তনীয়রূপে চিরকাল থাকে (*অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে*)। আত্মা নিত্য এবং চিরস্থায়ী, কিন্তু আত্মা যে দেহটি ধারণ করে তার পরিবর্তন হয়।

আত্মা দুই প্রকার—পরমাত্মা এবং জীবাত্মা। জীবাত্মার দেহে যেমন নানা প্রকার রূপান্তর হয়, তেমনই পরমাত্মাতে সৃষ্টির বিভিন্ন কল্প সংঘটিত হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন—

ষড়্ বিকারাঃ শরীরস্য ন বিষ্ণোস্তদ্গতস্য চ ।
তদধীনং শরীরং চ জ্ঞাত্বা তন্ মমতাং ত্যজেৎ ॥

যেহেতু শরীর আত্মার বাহ্যরূপ, তাই আত্মা শরীরের উপর নির্ভরশীল নয়; পক্ষান্তরে শরীর আত্মার উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছেন, তাঁর দেহ ধারণের জন্য উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয়। চিরকাল দেহ ধারণের কোন সম্ভাবনা নেই। *অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*। এটিই *ভগবদ্গীতার* (২/১৮) বাণী। জড় দেহটি অন্তবৎ (বিনাশশীল), কিন্তু দেহাভ্যন্তরস্থ আত্মা নিত্য (*নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ*)। ভগবান শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁর বিভিন্ন অংশ জীবাত্মা উভয়েই নিত্য। *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন পরম আত্মা, আর জীবেরা শ্রীবিষ্ণুর বিভিন্ন অংশ। ব্রহ্মাণ্ডের বিরাট শরীর থেকে শুরু করে একটি অতি ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত শরীরই বিনাশশীল, কিন্তু পরমাত্মা এবং আত্মা গুণগতভাবে এক হওয়ার ফলে উভয়েই নিত্য। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্লোক ১৯-২০

আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্ হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ ॥ ১৯ ॥
এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ ॥ ২০ ॥

আত্মা—ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবাত্মা; **নিত্যঃ**—জন্ম অথবা মৃত্যুরহিত; **অব্যয়ঃ**—ক্ষয় হওয়ার সম্ভাবনা রহিত; **শুদ্ধঃ**—আসক্তি এবং বিরক্তির জড় কলুষ

রহিত; **একঃ**—স্বতন্ত্র; **ক্ষেত্রজ্ঞঃ**—জ্ঞাতা এবং তাই জড় দেহ থেকে ভিন্ন; **আশ্রয়ঃ**—মূল ভিত্তি;[১] **অবিক্রিয়ঃ**—দেহের পরিবর্তনের মতো যাঁর পরিবর্তন হয় না;[২] **স্বদৃক্**—স্বয়ং প্রকাশিত;[৩] **হেতুঃ**—সর্বকারণের কারণ; **ব্যাপকঃ**—চেতনারূপে সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত; **অসঙ্গী**—দেহের উপর নির্ভরশীল নয় (এক শরীর থেকে আর এক শরীরে দেহান্তরিত হওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে); **অনাবৃতঃ**—জড় কলুষের দ্বারা আচ্ছাদিত নয়; **এতৈঃ**—এই সবের দ্বারা; **দ্বাদশভিঃ**—বারোটি; **বিদ্বান্**—যে ব্যক্তি মূর্খ নয়, পক্ষান্তরে বস্তু সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত; **আত্মনঃ**—আত্মার; **লক্ষণৈঃ**—লক্ষণ; **পরৈঃ**—চিন্ময়; **অহম্**—আমি ("আমার এই শরীরটিই আমি"); **মম**—আমার ("এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার"); **ইতি**—এইভাবে; **অসৎ-ভাবম্**—ভ্রান্ত ধারণা; **দেহাদৌ**—জড় দেহ এবং স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সমাজ, জাতি ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করা; **মোহজম্**—মোহ থেকে উৎপন্ন; **ত্যজেৎ**—পরিত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য।

অনুবাদ

'আত্মা' শব্দে ভগবান অথবা জীবকে বোঝায়। তাঁরা উভয়েই চিন্ময়, জন্ম-মৃত্যু রহিত, অব্যয়, জড় কলুষ থেকে মুক্ত, স্বতন্ত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, সব কিছুর আশ্রয়, বিকারশূন্য, আত্মদর্শী, সর্বকারণ, সর্বব্যাপ্ত, জড় দেহের উপর নির্ভরশীল নয়, এবং তাই সর্বদা অনাবৃত। যে ব্যক্তি আত্মার এই বারোটি গুণ সম্বন্ধে অবগত, তিনি যথার্থ বিদ্বান্, এবং তাঁর কর্তব্য "এই জড় শরীরটি আমি, এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছু আমার" মোহজনিত এই ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করা।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৫/৭) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টভাবে বলেছেন, *মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ*—"সমস্ত জীবেরাই আমার বিভিন্ন অংশ।" তাই জীবেরা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক। ভগবান হচ্ছেন নিয়ন্তা এবং সমস্ত জীবদের মধ্যে পরম। বেদে বলা হয়েছে, *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*—সমস্ত জীবের মধ্যে ভগবান

---

[১]আত্মার আশ্রয় ব্যতীত জড় দেহের অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

[২]পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, ঋতুর পরিবর্তন অনুসারে বৃক্ষের ফল এবং ফুলের জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং মৃত্যু, এই সমস্ত পরিবর্তন হলেও বৃক্ষ একইভাবে থাকে। তেমনই আত্মা সর্বতোভাবে বিকার রহিত।

[৩]আত্মার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হয় না; তা আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। সহজেই বোঝা যায় যে জীবের শরীরে আত্মা রয়েছে।

হচ্ছেন পরম, এবং অধীনস্থ সমস্ত জীবদের নিয়ন্তা। যেহেতু জীবেরা ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই গুণগতভাবে তারা ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। এক বিন্দু জলের রাসায়নিক গঠন যেমন বিশাল সমুদ্র থেকে অভিন্ন, ঠিক তেমনই জীবের গুণও ভগবান থেকে অভিন্ন। তার ফলে জীব ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক কিন্তু আয়তনগতভাবে ভিন্ন। ভগবানের প্রতিরূপ জীবকে জানার মাধ্যমে ভগবানকে জানা যায়, কারণ ভগবানের সমস্ত গুণগুলি অত্যন্ত অল্প মাত্রায় জীবের মধ্যে বর্তমান। এই সূত্রে জীব এবং ভগবানের মধ্যে একত্ব রয়েছে, কিন্তু ভগবান বিভু আর জীব অণু। *অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ান্* (*কঠোপনিষদ্* ১/২/২০)। জীব পরমাণুর থেকেও ক্ষুদ্র, কিন্তু ভগবান মহত্তম থেকেও মহত্তর। মহত্তম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আকাশ হতে পারে, কারণ আমরা মনে করি যে আকাশ অসীম, কিন্তু ভগবান আকাশের থেকেও বড়। তেমনই, আমরা জানি যে, কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগের সমান হওয়ার ফলে, জীব পরমাণু থেকেও ক্ষুদ্র, তবুও সর্বকারণের পরম কারণ হওয়ার গুণ ভগবান এবং জীব উভয়ের মধ্যেই রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জীবের উপস্থিতির ফলেই দেহের অস্তিত্ব এবং দেহের পরিবর্তন হয়। তেমনই, এই ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের অস্তিত্বের ফলেই প্রকৃতির পরিবর্তন হয়।

এই শ্লোকে *একঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) বিশ্লেষণ করা হয়েছে, *মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ।* মাটি, জল, বায়ু, আগুন, আকাশ, জীব আদি জড় এবং চেতন সব কিছুর অস্তিত্ব আত্মার উপর নির্ভরশীল। যদিও সব কিছুই ভগবানের প্রকাশ, তা বলে ভগবানকে কোন কিছুর উপর নির্ভরশীল বলে মনে করা উচিত নয়।

ভগবান এবং জীব উভয়েই পূর্ণ চেতন। জীবরূপে আমরা আমাদের দৈহিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে চেতন। তেমনই, ভগবান সমগ্র সৃষ্টি সম্বন্ধে চেতন। সেই কথা বেদে প্রতিপন্ন হয়েছে। *যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরীক্ষম্। বিজ্ঞাতারম্ অধিকেন বিজানীয়াৎ। একমেবাদ্বিতীয়ম্। আত্মজ্যোতিঃ সম্রাড়িহোবাচ। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত। সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্। অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।* এই সমস্ত বৈদিক নির্দেশগুলি প্রমাণ করে যে, পরমেশ্বর ভগবান এবং অণুসদৃশ জীব উভয়েরই অস্তিত্ব স্বতন্ত্র। একজন মহান এবং অন্যজন ক্ষুদ্র, কিন্তু উভয়েই সর্বকারণের কারণ—শারীরিকভাবে সীমিত এবং সর্বব্যাপ্তরূপে অসীম।

আমাদের সব সময় মনে রাখা উচিত যে, যদিও আমরা গুণগতভাবে ভগবানের সঙ্গে এক, তবুও আয়তনগতভাবে আমরা কখনই তাঁর সমান নই। নির্বোধ মানুষেরা, গুণগতভাবে নিজেদের ভগবানের সঙ্গে এক বলে দর্শন করে, মূর্খের

মতো মনে করে যে তারা ভগবানের সমান। তাদের বুদ্ধিকে বলা হয় *অবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ*—অমার্জিত বা কলুষিত বুদ্ধি। এই প্রকার ব্যক্তিরা বহু জন্ম-জন্মান্তরের কঠোর প্রচেষ্টার পর যখন পরম কারণকে জানতে পারেন, তখন অবশেষে তাঁরা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যথাযথভাবে জানতে পেরে তাঁর শরণাগত হন (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)। এইভাবে তাঁরা মহাত্মায় পরিণত হন। কেউ যদি ভগবানকে বিভু এবং জীবকে অণুরূপে জেনে ভগবানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত হন। জীব যখন তার জড় দেহটিকে তার স্বরূপ বলে মনে করে এবং জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বস্তুকে তার সম্পত্তি বলে মনে করে, তখন সে অজ্ঞানের অন্ধকারে অবস্থান করে। একে বলা হয় অহং *মম* (*জনস্য মোহোঽয়ম্ অহং মমেতি*)। এটিই হচ্ছে মোহ। মানুষের কর্তব্য এই ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করে সব কিছু সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত হওয়া।

শ্লোক ২১

স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ
ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈ-
রধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মগতিং লভেত ॥ ২১ ॥

স্বর্ণম্—সোনা; **যথা**—যেমন; **গ্রাবসু**—স্বর্ণখনিজ পাথরে; **হেম-কারঃ**—স্বর্ণবিশেষজ্ঞ; **ক্ষেত্রেষু**—স্বর্ণখনিতে; **যোগৈঃ**—বিভিন্ন পন্থার দ্বারা; **তৎ-অভিজ্ঞঃ**—যে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বুঝতে পারেন কোথায় সোনা রয়েছে; **আপ্নুয়াৎ**—অনায়াসে প্রাপ্ত হয়; **ক্ষেত্রেষু**—জড় ক্ষেত্রে; **দেহেষু**—মনুষ্য আদি চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন দেহে; **তথা**—তেমনই; **আত্ম-যোগৈঃ**—আধ্যাত্মিক পন্থার দ্বারা; **অধ্যাত্মবিৎ**—জড় এবং চেতনের পার্থক্য নিরূপণে সক্ষম অধ্যাত্মবিদ; **ব্রহ্ম-গতিম্**—আধ্যাত্মিক জীবনের সিদ্ধি; **লভেত**—লাভ করতে পারেন।

অনুবাদ

দক্ষ ভূতত্ত্ববিদ্ যেমন বুঝতে পারেন কোথায় সোনা রয়েছে, এবং বিভিন্ন পন্থার দ্বারা স্বর্ণবিশিষ্ট প্রস্তর থেকে স্বর্ণ সংগ্রহ করতে পারেন, তেমনই অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবিদ বুঝতে পারেন কিভাবে জড় দেহের মধ্যে চিন্ময় আত্মা রয়েছে, এবং

এইভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা তিনি আধ্যাত্মিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন। কিন্তু, অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন বুঝতে পারে না কোথায় সোনা রয়েছে, তেমনই যে ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন করেনি সে কখনই বুঝতে পারে না কিভাবে দেহের ভিতর আত্মা রয়েছে।

তাৎপর্য

এখানে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির একটি অত্যন্ত সুন্দর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। মূর্খ ব্যক্তিরা, এমন কি তথাকথিত জ্ঞানী, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকেরা দেহের ভিতরে আত্মার অস্তিত্ব বুঝতে পারে না, কারণ তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান নেই। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—আধ্যাত্মিক জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের শিক্ষা যথাযথভাবে লাভ না করলে যেমন কোন্ পাথরে সোনা রয়েছে তা বোঝা যায় না, তেমনই সদ্‌গুরুর কাছে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ না করলে বোঝা যায় না কোন্‌টি চিন্ময় আত্মা এবং কোন্‌টি জড় পদার্থ। এখানে বলা হয়েছে, *যোগৈস্তদভিজ্ঞঃ*। অর্থাৎ, যিনি আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমন্বিত তিনি দেহের অভ্যন্তরে চিন্ময় আত্মাকে উপলব্ধি করতে পারেন। কিন্তু, যে ব্যক্তি পাশবিক চেতনা সমন্বিত এবং যার কোন রকম আধ্যাত্মিক সংস্কার নেই, তার পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়। একজন দক্ষ খনিজবিদ বা ভূতত্ত্ববিদ যেমন বুঝতে পারেন কোথায় সোনা রয়েছে এবং তারপর তার অর্থ বিনিয়োগের দ্বারা সেই খনি খনন করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তা থেকে স্বর্ণ প্রাপ্ত হন, তেমনই একজন অভিজ্ঞ অধ্যাত্মবিদ বুঝতে পারেন জড়ের মধ্যে কোথায় আত্মা রয়েছে। যে ব্যক্তি যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করেনি, সে যেমন সোনা এবং পাথরের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না, তেমনই মূর্খ দুরাচারীরা, যারা সুদক্ষ গুরুদেবের কাছে আত্মা এবং জড় পদার্থ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়নি, তারা দেহের অভ্যন্তরে আত্মার অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। এই প্রকার জ্ঞান লাভ করতে হলে, যোগের পন্থায় শিক্ষিত হতে হয়, এবং অবশেষে ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করতে হয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্‌গীতায়* (১৮/৫৫) বলা হয়েছে, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন না করলে, দেহের অভ্যন্তরে আত্মার অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না। তাই *ভগবদ্‌গীতার* শুরুতেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না। (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩) এইভাবে প্রথম উপদেশ হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরে যে আত্মা রয়েছে এবং তা যে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হচ্ছে তা হৃদয়ঙ্গম করা। এটিই আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সূচনা। যে ব্যক্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবগত নয় অথবা তা জানতে অনিচ্ছুক, সে দেহাত্মবুদ্ধিতেই অথবা পাশবিক চেতনাতেই থাকে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* বলা হয়েছে—*যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে.....স এব গোখরঃ*। মানব-সমাজের প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য স্পষ্টরূপে *ভগবদ্গীতার* উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করা, কারণ তা হলেই কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে এবং আপনা থেকেই মোহের অন্ধকার দূর হবে, যার দ্বারা মানুষ মনে করে, "এই শরীরটিই আমি, এবং এই শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত যা কিছু তা সবই আমার (*অহং মমেতি*)।" এই প্রকার পাশবিক চেতনা অচিরেই পরিত্যাগ করা উচিত। আত্মা এবং যে ভগবানের সঙ্গে আমরা নিত্য সম্পর্কযুক্ত, সেই পরমাত্মা সম্বন্ধে মানুষের জানতে চেষ্টা করা উচিত। তার ফলে জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া যায়।

শ্লোক ২২

অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ প্রোক্তাস্ত্রয় এব হি তদ্গুণাঃ ।
বিকারাঃ ষোড়শাচার্যৈঃ পুমানেকঃ সমন্বয়াৎ ॥ ২২ ॥

অষ্টৌ—আট; **প্রকৃতয়ঃ**—প্রকৃতি; **প্রোক্তাঃ**—বলা হয়; **ত্রয়ঃ**—তিন; **এব**—নিঃসন্দেহে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণ; **বিকারাঃ**—বিকার; **ষোড়শ**—ষোল; **আচার্যৈঃ**—আচার্যদের দ্বারা; **পুমান্**—জীব; **একঃ**—এক; **সমন্বয়াৎ**—সমন্বয়ের ফলে।

অনুবাদ

ভগবানের আটটি ভিন্ন জড় শক্তি, তিনটি গুণ এবং ষোড়শ বিকার (একাদশ ইন্দ্রিয় এবং মাটি, জল আদি পঞ্চ মহাভূত)—এই সবের মধ্যে এক আত্মা সাক্ষীরূপে বিরাজমান। তাই সমস্ত মহান আচার্যেরা উল্লেখ করেছেন যে, আত্মা এই সমস্ত জড় উপাদানের দ্বারা আবদ্ধ।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে *ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈরধ্যাত্মবিদ্ ব্রহ্মগতিং লভেত*—"আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারেন চিন্ময় আত্মা কিভাবে জড় দেহের মধ্যে অবস্থান করে, এবং এইভাবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলন করার দ্বারা তিনি পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে পারেন।" দেহের মধ্যে আত্মার অনুসন্ধানে পারদর্শী বুদ্ধিমান ব্যক্তির আটটি বহিরঙ্গা শক্তি হৃদয়ঙ্গম করা অবশ্য কর্তব্য, যাদের সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/৪) বলা হয়েছে—

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥

"ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—এই অষ্ট প্রকারে আমার ভিন্না জড়া প্রকৃতি বিভক্ত।" ভূমিতে ইন্দ্রিয়ের সব কয়টি বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ নিহিত রয়েছে। ভূমিতে গোলাপ ফুলের সুগন্ধ, মিষ্ট ফলের স্বাদ এবং আমরা যা কিছু চাই তা সবই রয়েছে। সেই সম্বন্ধে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১/১০/৪) বলা হয়েছে, *সর্বকামদুঘা মহী*—পৃথিবীতে (মহী) আমাদের সমস্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি রয়েছে। তার ফলে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সমস্ত বিষয়গুলি ভূমি বা পৃথিবীতে রয়েছে। স্থূল জড় উপাদান এবং সূক্ষ্ম জড় উপাদান (মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার) দিয়ে সমগ্র জড়া প্রকৃতি রচিত।

জড়া প্রকৃতিতে রয়েছে তিনটি গুণ—সত্ত্বগুণ, রজোগুণ এবং তমোগুণ। এই গুণগুলি আত্মার নয়, জড়া প্রকৃতির। এই তিনটি গুণের মিথষ্ক্রিয়ার ফলে পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, এবং তাদের নিয়ন্তা মনের প্রকাশ হয়। তারপর এই গুণ অনুসারে জীব বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান, চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছা সহকারে বিভিন্ন প্রকার কর্ম অনুষ্ঠান করার সুযোগ লাভ করে। এইভাবে দেহরূপ যন্ত্রটি কার্য করতে শুরু করে।

এগুলি যথাযথভাবে সাংখ্যযোগের মহান আচার্যগণ, বিশেষ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার দেবহূতি-পুত্র কপিল বিশ্লেষণ করেছেন। সেই কথা এখানে *আচার্যৈঃ* শব্দটির দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রামাণিক আচার্য ব্যতীত অন্য কাউকে অনুসরণ করার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। *আচার্যবান্ পুরুষো বেদ*—কেউ যখন দক্ষ আচার্যের শরণ গ্রহণ করেন, তখন তিনি পূর্ণরূপে সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন।

জীবের স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, কিন্তু শরীর বিভিন্ন জড় উপাদানের সমন্বয়। তার প্রমাণ দেখা যায় যখন জীব সেই জড় উপাদানের মিশ্রণটি ত্যাগ করে, তখন তা

একটি জড় পিণ্ডে পরিণত হয়। এই জড় পদার্থ জড় জগতের সঙ্গে গুণগতভাবে এক, এবং চিন্ময় আত্মা ভগবানের সঙ্গে গুণগতভাবে এক। ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়, এবং জীবাত্মাও এক, কিন্তু স্বতন্ত্র আত্মা জড় শক্তির সমন্বয়ের ফলে গঠিত দেহের ঈশ্বর, কিন্তু ভগবান সমগ্র জড় জগতের ঈশ্বর। জীব তার বিশেষ শরীরের ঈশ্বর, এবং তার কার্যকলাপ অনুসারে সে বিভিন্ন প্রকার সুখ এবং দুঃখ ভোগ করে। কিন্তু, পরম পুরুষ পরমাত্মা এক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে সমস্ত শরীরে বিরাজমান।

জড়া প্রকৃতিকে চব্বিশটি উপাদানে প্রকৃতপক্ষে বিভক্ত করা হয়। জড় দেহের দেহী জীবাত্মা হচ্ছে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব, এবং সর্বোপরি রয়েছেন পরমাত্মারূপে ভগবান শ্রীবিষ্ণু, এবং সেই পরম নিয়ন্তা হচ্ছেন ষড়বিংশতি তত্ত্ব। কেউ যখন এই ছাব্বিশটি তত্ত্বই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন, তখন তিনি অধ্যাত্মবিদ্ হন, অর্থাৎ জড় পদার্থ এবং চেতন আত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গমে দক্ষ হন। *ভগবদ্গীতায়* (১৩/৩) বলা হয়েছে, *ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানম্*—ক্ষেত্র (শরীর), আত্মা এবং পরমাত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করাই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞান। যতক্ষণ মানুষ আত্মার সঙ্গে ভগবানের নিত্য সম্পর্ক হৃদয়ঙ্গম করতে না পারে, ততক্ষণ তার জ্ঞান অপূর্ণ। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥

"বহু জন্মের পর তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আমাকে সর্ব-কারণের পরম কারণরূপে জেনে আমার শরণাগত হন। সেইরূপ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ।" জড় এবং চেতন সব কিছুই বাসুদেবের বিভিন্ন শক্তি। সেই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় অংশ জীব তাঁর অধীন তত্ত্ব। এই পূর্ণজ্ঞান যখন লাভ হয়, তখন জীব পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয় (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ*)।

শ্লোক ২৩

দেহস্তু সর্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা ।
অত্রৈব মৃগ্যঃ পুরুষো নেতি নেতীত্যতৎ ত্যজন্ ॥ ২৩ ॥

দেহঃ—শরীর; **তু**—কিন্তু; **সর্ব-সংঘাতঃ**—চব্বিশটি তত্ত্বের সমন্বয়; **জগৎ**—গতিশীল; **তস্থুঃ**—এবং স্থাবর; **ইতি**—এইভাবে; **দ্বিধা**—দুই প্রকার; **অত্র এব**—এই বিষয়ে;

মৃগ্যঃ—অন্বেষণীয়; **পুরুষঃ**—জীব, আত্মা; **ন**—না; **ইতি**—এইভাবে; **ন**—না; **ইতি**—এইভাবে; **ইতি**—এইভাবে; **অতৎ**—যা আত্মা নয়; **ত্যজন্**—পরিত্যাগ করে।

অনুবাদ

প্রতিটি জীবের দুই প্রকার শরীর রয়েছে—পঞ্চ-ভূতাত্মক স্থূল শরীর এবং মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের দ্বারা রচিত সূক্ষ্ম শরীর। এই শরীরের মধ্যে রয়েছে চিন্ময় আত্মা। মানুষের কর্তব্য "এটি নয়, এটি নয়," এইভাবে বিচার করে আত্মার অনুসন্ধান করা এবং এইভাবে চিন্ময় আত্মা ও জড় পদার্থের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, *স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ*। অভিজ্ঞ ব্যক্তি যেমন মাটি পরীক্ষা করে বুঝতে পারেন কোথায় স্বর্ণ রয়েছে এবং তারপর সেই স্থান খনন করতে শুরু করেন, তারপর তিনি নাইট্রিক অ্যাসিড দিয়ে সেই পাথর বিশ্লেষণ করে স্বর্ণ পরীক্ষা করেন, তেমনই আত্মার অন্বেষণ করার জন্য সারা শরীরের বিশ্লেষণ করা মানুষের কর্তব্য। নিজের শরীর বিশ্লেষণ করার সময় মানুষের প্রশ্ন করা উচিত তার মাথাটি কি তার আত্মা, তার আঙ্গুলগুলি কি তার আত্মা, তার হাতটি কি তার আত্মা, ইত্যাদি। এইভাবে একে একে সমস্ত জড় তত্ত্ব এবং জড় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত শরীরটিকে অতিক্রম করতে হয়। তারপর, কেউ যদি সত্য সত্যই দক্ষ হন এবং আচার্যকে অনুসরণ করেন, তা হলে তিনি বুঝতে পারেন যে, তিনি হচ্ছেন দেহের অভ্যন্তরে বিরাজমান চিন্ময় আত্মা। সর্বশ্রেষ্ঠ আচার্য শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* তাঁর উপদেশের শুরুতেই বলেছেন—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা ।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

"দেহী যেভাবে কৌমার, যৌবন এবং জরার মাধ্যমে দেহের রূপ পরিবর্তন করে চলে, মৃত্যুকালে তেমনই ঐ দেহী (আত্মা) এক দেহ থেকে অন্য কোনও দেহে দেহান্তরিত হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা কখনও এই পরিবর্তনে মুহ্যমান হন না।" (*ভগবদ্গীতা* ২/১৩) আত্মা দেহের মালিক এবং সে দেহের ভিতরে রয়েছে। সেটিই হচ্ছে প্রকৃত বিশ্লেষণ। আত্মা কখনও শরীরের উপাদানগুলির সঙ্গে মিশ্রিত হয় না। আত্মা যদিও দেহের ভিতরে রয়েছে, তবুও সে পৃথক এবং সর্বদাই শুদ্ধ।

মানুষের কর্তব্য এইভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে আত্মাকে উপলব্ধি করা। সেটিই আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান। *নেতি নেতি* হচ্ছে বিশ্লেষণের মাধ্যমে জড় পদার্থগুলি পরিত্যাগ করার পন্থা। দক্ষতাপূর্বক এইভাবে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বোঝা যায় আত্মা কোথায় রয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি দক্ষ নয়, সে সোনা এবং মাটির অথবা আত্মা এবং জড় শরীরের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না।

শ্লোক ২৪

অন্বয়ব্যতিরেকেণ বিবেকেনোশতাত্মনা ।
স্বর্গস্থানসমাম্নায়ৈর্বিমৃশদ্ভিরসত্ত্বরৈঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়—প্রত্যক্ষভাবে; **ব্যতিরেকেণ**—এবং পরোক্ষভাবে; **বিবেকেন**—পরিপক্ক বিচারের দ্বারা; **উশতা**—শুদ্ধ; **আত্মনা**—মনের দ্বারা; **স্বর্গ**—সৃষ্টি; **স্থান**—পালন; **সমাম্নায়ৈঃ**—এবং বিনাশের দ্বারা; **বিমৃশদ্ভিঃ**—যারা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের দ্বারা; **অসত্ত্বরৈঃ**—অত্যন্ত ধীর।

অনুবাদ

ধীর এবং দক্ষ ব্যক্তিদের কর্তব্য, বিশ্লেষণের দ্বারা পবিত্র মনের সাহায্যে সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশধর্মী সমস্ত বস্তুর সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক এবং পার্থক্য নিরূপণ করা।

তাৎপর্য

ধীর ব্যক্তি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে দেহ ও আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন। যেমন, কেউ যখন মাথা, হাত, পা ইত্যাদি সমন্বিত তার দেহের কথা বিচার করে, তখন সে নিশ্চিতভাবে তার দেহের সঙ্গে তার আত্মার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কেউ বলে না, "আমি মাথা", সকলেই বলে "আমার মাথা"। অতএব দুটি বস্তু রয়েছে—মাথা এবং 'আমি'। যদিও তারা একত্রীভূত বলে মনে হয় তবুও তারা এক নয়।

কেউ প্রশ্ন করতে পারে, "আমরা যখন দেহের বিশ্লেষণ করি, তখন আমরা দেখতে পাই যে মাথা, হাত, পা, উদর, রক্ত, অস্থি, মল, মূত্র ইত্যাদি রয়েছে, কিন্তু এই সব কিছু বিচার করার পরেও আত্মার অস্তিত্ব কোথায়?" কিন্তু ধীর ব্যক্তি বৈদিক উপদেশের সুযোগ নিয়ে সেই কথা জানতে পারেন—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন যাতানি জীবন্তি। যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। তদ্ ব্রহ্মেতি। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩/১/১)।

এইভাবে তিনি জানতে পারেন যে মাথা, হাত, পা, প্রকৃতপক্ষে সমস্ত শরীরটি আত্মার ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। আত্মার উপস্থিতির ফলেই দেহ, মাথা, হাত, পা ইত্যাদির বৃদ্ধি হয়, তা না হলে হয় না। একটি মৃত শিশুর বৃদ্ধি হয় না, কারণ তার শরীরে আত্মার উপস্থিতি নেই। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেহের বিশ্লেষণ করা সত্ত্বেও কেউ যদি আত্মার উপস্থিতি অনুভব না করে, তা হলে বুঝতে হবে যে তার কারণ হচ্ছে তার অজ্ঞতা। জড়-জাগতিক কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তির পক্ষে, কেশাগ্রের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগ আয়তন বিশিষ্ট অতি সূক্ষ্ম আত্মাকে উপলব্ধি করা কি করে সম্ভব? এই প্রকার মানুষেরা মূর্খের মতো মনে করে যে, রাসায়নিক পদার্থের সংমিশ্রণে জড় দেহের সৃষ্টি হয়েছে, যদিও সেই সমস্ত রাসায়নিক তত্ত্বগুলি তারা কখনও খুঁজে পায় না। *বেদ* কিন্তু বলছে যে, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে জীবনের উদ্ভব হয় না; জীবন আসে আত্মা এবং পরমাত্মা থেকে, এই জীবনী শক্তির ভিত্তিতেই দেহের বৃদ্ধি হয়। গাছের উপস্থিতির ফলেই সেই গাছের ফলের ছয় প্রকার পরিবর্তন হয়। যদি গাছ না থাকে, তা হলে ফলের বৃদ্ধি এবং পরিপক্কতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই দেহের অস্তিত্বের ঊর্ধ্বে আত্মা এবং পরমাত্মার অস্তিত্ব রয়েছে। এটিই *ভগবদ্গীতায়* বিশ্লেষিত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের প্রথম উপলব্ধি—*দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে* । ভগবান এবং তাঁর ভিন্ন অংশ জীবের উপস্থিতির ফলেই দেহের অস্তিত্ব রয়েছে। তার বিশ্লেষণ করে *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪) ভগবান বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই।" পরমাত্মা সর্বত্রই বিরাজমান। বেদে বলা হয়েছে, *সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম*—সব কিছুই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তির বিস্তার। *সূত্রে মণিগণা ইব*—মুক্তামালায় মুক্তাগুলি যেমন সূত্রের দ্বারা একত্রে গাঁথা থাকে, তেমনই সব কিছুই ভগবানের উপর আশ্রিত। এই সূত্র হচ্ছে পরম ব্রহ্ম। তিনি পরম কারণ, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর উপর সব কিছু আশ্রিত (*মত্তঃ পরতরং নান্যৎ*)। এইভাবে আমাদের আত্মা এবং পরমাত্মার অধ্যয়ন করতে হয়, যাঁদের উপর সমগ্র জড় জগৎ আশ্রিত। *যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি*—এই বৈদিক উক্তিতে তার বিশ্লেষণ হয়েছে।

শ্লোক ২৫

বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৫ ॥

বুদ্ধেঃ—বুদ্ধির; **জাগরণম্**—স্থূল ইন্দ্রিয়ের জাগ্রত বা সক্রিয় অবস্থা; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন (স্থূল শরীর ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের সক্রিয় অবস্থা); **সুষুপ্তিঃ**—গভীর নিদ্রা বা সমস্ত কার্যকলাপের নিবৃত্তি (যদিও জীব দ্রষ্টা); **ইতি**—এইভাবে; **বৃত্তয়ঃ**—বিভিন্ন কার্যকলাপ; **তাঃ**—তারা; **যেন**—যার দ্বারা; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **অনুভূয়ন্তে**—অনুভূত হয়; **সঃ**—তার; **অধ্যক্ষঃ**—পর্যবেক্ষক (যিনি কার্যকলাপ থেকে ভিন্ন); **পুরুষঃ**—ভোক্তা; **পরঃ**—চিন্ময়।

অনুবাদ

বুদ্ধির তিনটি বৃত্তি—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। যিনি এই তিনটি বৃত্তিকেই অনুভব করেন, তিনিই আদি নিয়ন্তা, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর ভগবান।

তাৎপর্য

বুদ্ধি ব্যতীত ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ কার্যকলাপ হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, এমন কি স্বপ্ন অথবা সমস্ত স্থূল এবং সূক্ষ্ম কার্যকলাপের নিবৃত্তিও উপলব্ধি করা যায় না। উপদ্রষ্টা এবং নিয়ন্তা হচ্ছেন ভগবান বা পরমাত্মা, যাঁর নির্দেশনায় জীবাত্মা বুঝতে পারে কখন সে জাগ্রত, কখন সে নিদ্রিত এবং কখন সে সম্পূর্ণরূপে সমাধিস্থ। *ভগবদ্গীতায়* (১৫/১৫) ভগবান বলেছেন, *সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*—"আমি সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং আমার থেকেই স্মৃতি, জ্ঞান এবং বিস্মৃতি আসে।" সমস্ত জীবেরা তাদের বুদ্ধির মাধ্যমে জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি—এই তিনটি অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন। প্রতিটি জীবের সঙ্গে সব সময় সখারূপে থাকেন যে ভগবান, তিনিই বুদ্ধি প্রদান করেন। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন যে, জীবের বুদ্ধি যখন কর্মের ঊর্ধ্বে সুখ এবং দুঃখকে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করে, তখন জীবকে বলা হয় সত্ত্ববুদ্ধি। স্বপ্নের অবস্থায় উপলব্ধি আসে ভগবান থেকে (*মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ*)। ভগবান বা পরমাত্মা হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা এবং তাঁর পরিচালনায় জীবেরা হচ্ছে উপনিয়ন্তা। মানুষের কর্তব্য তার বুদ্ধির সাহায্যে ভগবানকে জানা।

শ্লোক ২৬

এভিস্ত্রিবর্ণৈঃ পর্যস্তৈর্বুদ্ধিভেদৈঃ ক্রিয়োদ্ভবৈঃ ।
স্বরূপমাত্মনো বুধ্যেদ্ গন্ধৈর্বায়ুমিবান্বয়াৎ ॥ ২৬ ॥

এভিঃ—এগুলির দ্বারা; **ত্রিবর্ণৈঃ**—তিন গুণের দ্বারা রচিত; **পর্যস্তৈঃ**—পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে (জীবনী শক্তিকে স্পর্শ না করার ফলে); **বুদ্ধি**—বুদ্ধি; **ভেদৈঃ**—পার্থক্য; **ক্রিয়া-উদ্ভবৈঃ**—বিভিন্ন কার্যকলাপ থেকে উদ্ভূত; **স্বরূপম্**—স্বরূপ; **আত্মনঃ**—আত্মার; **বুধ্যেৎ**—বোঝা উচিত; **গন্ধৈঃ**—গন্ধের দ্বারা; **বায়ুম্**—বায়ু; **ইব**—সদৃশ; **অন্বয়াৎ**—ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে।

অনুবাদ

সৌরভের দ্বারা যেমন বায়ুর উপস্থিতি অনুভব করা যায়, তেমনই ভগবানের পরিচালনায় বুদ্ধির এই তিন বিভাগের দ্বারা আত্মাকে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। এই তিনটি বিভাগ কিন্তু আত্মা নয়; সেগুলি তিন গুণ সমন্বিত এবং ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন।

তাৎপর্য

পূর্বেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, আমাদের অস্তিত্বের তিনটি অবস্থা রয়েছে—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি। এই তিনটি অবস্থাতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা অনুভব করি। এইভাবে আত্মা এই তিনটি অবস্থার দ্রষ্টা। প্রকৃতপক্ষে, দেহের কার্যকলাপ আত্মার কার্যকলাপ নয়। আত্মা দেহ থেকে ভিন্ন। ঠিক যেমন সৌরভ তার বাহক বায়ু থেকে ভিন্ন, তেমনই আত্মাও জড় কার্যকলাপ থেকে অনাসক্ত থাকে। এই বিশ্লেষণ তিনিই করতে পারেন, যিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত। *বেদে* সেই কথা প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, *যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবং বিজ্ঞাতং ভবতি*। কেউ যদি ভগবানকে জানতে পারে, তা হলে আপনা থেকেই তার অন্য সব কিছুই জানা হয়ে যায়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ না করার ফলে, বড় বড় পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং ধর্মনেতারাও সর্বদাই মোহাচ্ছন্ন। সেই কথা *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/২/৩২) প্রতিপন্ন হয়েছে—

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ ।

কেউ যদি কৃত্রিমভাবে নিজেকে জড় কলুষ থেকে মুক্ত বলে মনে করে, তবুও সে যদি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত না হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে তার বুদ্ধি কলুষিত। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৩/৪২) বলা হয়েছে—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥

ইন্দ্রিয়ের ঊর্ধ্বে রয়েছে মন, মনের ঊর্ধ্বে বুদ্ধি এবং বুদ্ধির ঊর্ধ্বে আত্মা। চরমে, বুদ্ধি যখন ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে নির্মল হয়, তখন জীব বুদ্ধিযোগের স্তর প্রাপ্ত হয়। সেই সম্বন্ধেও *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে—*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে*। ভগবদ্ভক্তি যখন বিকশিত হয় তখন বুদ্ধি নির্মল হয়, এবং তখন ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই বুদ্ধি ব্যবহার করা যায়।

শ্লোক ২৭

এতদ্দ্বারো হি সংসারো গুণকর্মনিবন্ধনঃ ।
অজ্ঞানমূলোঽপার্থোঽপি পুংসঃ স্বপ্ন ইবার্প্যতে ॥ ২৭ ॥

এতৎ—এই; **দ্বারঃ**—যার দ্বার; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সংসারঃ**—জড় জগৎ, যেখানে জীব ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করে; **গুণ-কর্ম-নিবন্ধনঃ**—জড়া প্রকৃতির ত্রিগুণের দ্বারা আবদ্ধ; **অজ্ঞান-মূলঃ**—অজ্ঞান যার মূল; **অপার্থঃ**—অবাস্তব; **অপি**—যদিও; **পুংসঃ**—জীবের; **স্বপ্নঃ**—স্বপ্ন; **ইব**—সদৃশ; **অর্প্যতে**—স্থাপন করা হয়।

অনুবাদ

কলুষিত বুদ্ধির ফলে মানুষ জড়া প্রকৃতির গুণের বশীভূত হয়, এবং তার ফলে সে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। স্বপ্নে যেমন মানুষ অলীক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তেমনই অজ্ঞানজনিত সংসার অবাঞ্ছিত এবং নশ্বর।

তাৎপর্য

নশ্বর জীবনের অবাঞ্ছিত অবস্থাকে বলা হয় অজ্ঞান। মানুষ সহজেই বুঝতে পারে যে, জড় দেহ নশ্বর, কারণ এক বিশেষ সময়ে তার উৎপত্তি হয়, এবং জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, স্থিতি, রূপান্তর এবং ক্ষয়—এই ছয়টি অবস্থা পার করে এক নিশ্চিত সময়ে তার বিনাশ হয়। নিত্য আত্মার এই অবস্থার কারণ অজ্ঞান, এবং যদিও তা ক্ষণস্থায়ী, তা অবাঞ্ছিত। অজ্ঞানের ফলে জীব একটি অনিত্য দেহের পর আর

একটি অনিত্য দেহ ধারণ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু জীবাত্মার এই ধরনের অনিত্য দেহে প্রবেশ করার কোন আবশ্যকতা নেই। তার অজ্ঞানের ফলে অথবা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে য়াওয়ার ফলে তাকে তা করতে হয়। তাই মনুষ্য-জীবনে যখন বিকশিত বুদ্ধি লাভ হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণকে জানার চেষ্টা করার মাধ্যমে চেতনার পরিবর্তন সাধন করা উচিত। তার ফলে মুক্ত হওয়া যায়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" শ্রীকৃষ্ণকে জেনে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন না করলে, জড় জগতের বন্ধনেই আবদ্ধ থাকতে হয়। এই বদ্ধ অবস্থার নিবৃত্তি সাধনের জন্য ভগবানের শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। বস্তুতপক্ষে ভগবান তা দাবি করেছেন—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*।

মহারাজ ঋষভদেব সেই সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছেন—*ন সাধু মন্যে যত আত্মনোঽয়মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ* । মানুষের কর্তব্য যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সহকারে হৃদয়ঙ্গম করা যে, দেহটি অনিত্য এবং তা চিরকাল থাকবে না, এবং যতক্ষণ দেহটি রয়েছে ততক্ষণ জড় জগতের দুঃখকষ্ট ভোগ করতেই হবে। তাই, সাধুসঙ্গের প্রভাবে, সদ্গুরুর উপদেশে, কেউ যদি কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে এই জড় জগতে তাঁর বদ্ধ অবস্থার সমাপ্তি হবে, এবং তাঁর কৃষ্ণভাবনামৃতরূপ মূল চেতনা পুনর্জাগরিত হবে। কেউ যখন কৃষ্ণভাবনাময় হন, তখন তিনি উপলব্ধি করতে পারেন যে, জড় অস্তিত্ব, তা জাগ্রত অবস্থাতেই হোক বা স্বপ্নাবস্থাতেই হোক তা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয় এবং তার কোন প্রকৃত মূল্য নেই। এই উপলব্ধি ভগবানের কৃপার ফলেই সম্ভব। ভগবানের এই কৃপাও *ভগবদ্গীতার* উপদেশরূপে বর্তমান। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে নির্দেশ দিয়েছেন, সমস্ত মূর্খ জীবদের, বিশেষ করে মানুষদের জাগরিত করার পরোপকারের ধর্ম গ্রহণ করতে, যাতে সকলে কৃষ্ণভক্তির স্তরে আসতে পারে এবং বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য নিম্নলিখিত শ্লোক দুটির উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

দুঃখরূপোঽপি সংসারো বুদ্ধিপূর্বমবাপ্যতে ।
যথা স্বপ্নে শিরশ্ছেদং স্বয়ং কৃত্বাত্মনো বশঃ ॥

ততো দুঃখমাবাপ্যেত তথা জাগরিতোঽপি তু ।
জানন্নপ্যাত্মনো দুঃখমবশস্তু প্রবর্ততে ॥

মানুষের বোঝা উচিত যে, জড়-জাগতিক জীবন দুঃখময়। বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা তা উপলব্ধি করা যায়। বুদ্ধি যখন নির্মল হয় তখন মানুষ বুঝতে পারে যে অবাঞ্ছিত, অনিত্য জড়-জাগতিক জীবন ঠিক একটি স্বপ্নের মতো। ঠিক যেমন স্বপ্নে মাথা কাটা গেলে বেদনা অনুভব হয়, কিন্তু অজ্ঞানবশত কেবল স্বপ্ন দেখার সময়ই দুঃখকষ্ট ভোগ হয় না, জাগ্রত অবস্থাতেও হয়। ভগবানের কৃপা ব্যতীত জীব অজ্ঞানেই পড়ে থাকে এবং নানাভাবে দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

শ্লোক ২৮

তস্মাদ্ভবদ্ভিঃ কর্তব্যং কর্মণাং ত্রিগুণাত্মনাম্ ।
বীজনির্হরণং যোগঃ প্রবাহোপরমো ধিয়ঃ ॥ ২৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **ভবদ্ভিঃ**—তোমাদের দ্বারা; **কর্তব্যম্**—করণীয়; **কর্মণাম্**—সমস্ত কর্মের; **ত্রিগুণ-আত্মনাম্**—ত্রিগুণাত্মক; **বীজ-নির্হরণম্**—বীজ দগ্ধ করে; **যোগঃ**—ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পন্থা; **প্রবাহ**—জাগ্রত, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তির নিরন্তর ধারা; **উপরমঃ**—নিবৃত্তি; **ধিয়ঃ**—বুদ্ধি।

অনুবাদ

অতএব, হে বন্ধু দৈত্যবালকগণ, তোমাদের কর্তব্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা, যার ফলে জড়া প্রকৃতির প্রভাবে কৃত্রিমভাবে উৎপন্ন সকাম কর্মের বীজ দগ্ধ হবে এবং জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধির প্রবাহ নিবৃত্ত হবে। অর্থাৎ, কেউ যখন কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তখন তাঁর অজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে দূর হয়ে যায়।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) প্রতিপন্ন হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে ।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

"যিনি ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে আমার সেবা করেন, এবং যিনি কোন অবস্থাতেই অধঃপতিত হন না, তিনিই প্রকৃতির সমস্ত গুণ অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত অবস্থায়

উন্নীত হয়েছেন।" ভক্তিযোগের অনুশীলনের ফলে, তৎক্ষণাৎ প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার অতীত চিন্ময় স্তরে উন্নীত হওয়া যায়। অজ্ঞানের মূল হচ্ছে জড় চেতনা, যা আধ্যাত্মিক চেতনা বা কৃষ্ণভাবনার দ্বারা বিনাশ করা অবশ্য কর্তব্য। *বীজনির্হরণম্* শব্দটির অর্থ জড়-জাগতিক জীবনের মূল কারণ ভস্মীভূত করা। মেদিনী অভিধানে, *যোগ* শব্দটির অর্থ তার ফল রূপে প্রদান করা হয়েছে—*যোগেঽপূর্বার্থসম্প্রাপ্তৌ সঙ্গতিধ্যানযুক্তিষু*। অজ্ঞানবশত বিষম পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়কে বলা হয় যোগ। তাকে মুক্তিও বলা হয়। *মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ*। *মুক্তি* শব্দটির অর্থ হচ্ছে, অজ্ঞান বা মোহজনিত স্থিতির ফলে জীব যে তার স্বরূপ বিস্মৃত হয়, সেই অবস্থা পরিত্যাগ করা। স্বীয় স্বরূপে প্রত্যাবর্তনের নামই হচ্ছে মুক্তি, এবং যে পন্থার দ্বারা তা লাভ করা হয় তাকে বলা হয় যোগ। এইভাবে যোগ হচ্ছে কর্ম, জ্ঞান এবং সাংখ্যেরও ঊর্ধ্বে। বাস্তবিকপক্ষে, যোগ হচ্ছে জীবনের চরম লক্ষ্য। তাই শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যোগী হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন (*তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন*)। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* আরও বলেছেন যে, যিনি ভগবদ্ভক্তির পদ প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" (*ভগবদ্গীতা* ৬/৪৭) এইভাবে যিনি সর্বদা তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। এই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগের পন্থা অনুশীলনের ফলে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ২৯

তত্রোপায়সহস্রাণাময়ং ভগবতোদিতঃ ।
যদীশ্বরে ভগবতি যথা যৈরঞ্জসা রতিঃ ॥ ২৯ ॥

তত্র—সেই সম্পর্কে (ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার); **উপায়**—পন্থা; **সহস্রাণাম্**—হাজার হাজার; **অয়ম্**—এই; **ভগবতা উদিতঃ**—ভগবান প্রদত্ত; **যৎ**—যা; **ঈশ্বরে**—ভগবানে; **ভগবতি**—ভগবান; **যথা**—যতখানি; **যৈঃ**—যার দ্বারা; **অঞ্জসা**—শীঘ্র; **রতিঃ**—প্রীতি।

অনুবাদ

ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যে সমস্ত উপায় রয়েছে, তার মধ্যে স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পন্থাটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানতে হবে। সেই পন্থাটি হচ্ছে ভগবৎ প্রেম বিকশিত করার কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান।

তাৎপর্য

যে সমস্ত যোগের পন্থা মানুষকে জড় জগতের কলুষের বন্ধন থেকে চিন্ময় স্তরে উন্নীত করে, তাদের মধ্যে যে পন্থাটি ভগবান স্বয়ং প্রদান করেছেন, সেটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণ করতে হবে। সেই পন্থা স্পষ্টভাবে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে, যেখানে ভগবান বলেছেন, *সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*—"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও।" সেটিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা কারণ ভগবান প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, *অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ*—'আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই জন্য তুমি কোন চিন্তা করো না।" ভগবান আশ্বাস দিয়েছেন যে, তিনি তাঁর ভক্তকে রক্ষা করবেন এবং সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন, তাই দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। পাপের ফলেই জীবের ভব-বন্ধন। তাই, ভগবান যেহেতু আশ্বাস দিয়েছেন যে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করবেন, সেই জন্য দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। অতএব আত্মারূপে নিজের স্বরূপ অবগত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার পন্থাই সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত বৈদিক কার্যক্রম এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এবং বেদের নির্দেশ থেকে তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥

"ভগবান এবং শ্রীগুরুদেব উভয়ের প্রতি যে মহাত্মা ঐকান্তিক ভক্তিপরায়ণ, তাঁর কাছে সমস্ত বৈদিক জ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।" (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্* ৬/২৩) ভগবানের প্রতিনিধি শুদ্ধ ভক্তকে গুরুরূপে বরণ করতে হয় এবং তাঁকে ভগবানেরই মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করতে হয়। সেটিই হচ্ছে সাফল্যের রহস্য। যিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁর কাছে সিদ্ধিলাভের উপায় আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। এই শ্লোকে *যৈরঞ্জসা রতিঃ* পদটি ইঙ্গিত করে যে, শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করার ফলে ভগবদ্ভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়া যায়, এবং ভগবদ্ভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে ধীরে ধীরে ভগবানের প্রতি আসক্ত হওয়া যায়। ভগবানের প্রতি এই আসক্তির ফলে ভগবানকে জানা যায়। পক্ষান্তরে বলা যায়

যে, ভগবান কে, আমরা কে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি, এই সমস্ত জ্ঞান অনায়াসে ভক্তিযোগের মাধ্যমে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভক্তিযোগের স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই ভব-বন্ধন এবং জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ বিনষ্ট হয়ে যায়। সেই কথা স্পষ্টভাবে পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যা সাফল্যের রহস্য ব্যক্ত করে।

শ্লোক ৩০-৩১

গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সর্বলব্ধার্পণেন চ ।
সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ ॥ ৩০ ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াং চ কীর্তনৈর্গুণকর্মণাম্ ।
তৎপাদাম্বুরুহধ্যানাৎ তল্লিঙ্গেক্ষার্হণাদিভিঃ ॥ ৩১ ॥

গুরু-শুশ্রূষয়া—সদ্‌গুরুর সেবা করার দ্বারা; **ভক্ত্যা**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **সর্ব**—সমস্ত; **লব্ধ**—জড়-জাগতিক লাভ; **অর্পণেন**—অর্পণ করার দ্বারা (শ্রীগুরুদেবকে অথবা শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণকে); **চ**—এবং; **সঙ্গেন**—সঙ্গের দ্বারা; **সাধু-ভক্তানাম্**—ভক্ত এবং সাধুদের; **ঈশ্বর**—ভগবানের; **আরাধনেন**—আরাধনার দ্বারা; **চ**—এবং; **শ্রদ্ধয়া**—ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সহকারে; **তৎ-কথায়াম্**—ভগবানের কথা আলোচনায়; **চ**—এবং; **কীর্তনৈঃ**—মহিমা কীর্তনের দ্বারা; **গুণ-কর্মণাম্**—ভগবানের দিব্যগুণ এবং কার্যকলাপের; **তৎ**—তাঁর; **পাদ-অম্বুরুহ**—শ্রীপাদপদ্মের; **ধ্যানাৎ**—ধ্যানের দ্বারা; **তৎ**—তাঁর; **লিঙ্গ**—রূপ (বিগ্রহ); **ঈক্ষ**—দর্শন করে; **অর্হণ-আদিভিঃ**—এবং পূজার দ্বারা।

অনুবাদ

মানুষের কর্তব্য সদ্‌গুরু গ্রহণ করে গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করা। নিজের যা কিছু রয়েছে তা সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা উচিত, এবং সাধু ও ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের আরাধনা করা, শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা, ভগবানের দিব্য গুণাবলী এবং কার্যকলাপের মহিমা কীর্তন করা, সর্বদা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করা এবং শাস্ত্র ও গুরুর নির্দেশ অনুসারে গভীর নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা উচিত।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে, যে পন্থা অচিরেই ভগবানের প্রতি প্রেম এবং অনুরাগ বর্ধিত করে, হাজার হাজার পন্থার মধ্যে সেটিই ভব-বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। আরও বলা হয়েছে, *ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্*—প্রকৃতপক্ষে ধর্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গুহ্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের পন্থা গ্রহণ করার ফলে অনায়াসেই তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। যেমন বলা হয়েছে, *ধর্মং তু সাক্ষাদ্ ভগবৎপ্রণীতম্*—ধর্মের তত্ত্ব ভগবানই প্রণয়ন করেছেন, কারণ তিনিই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। সেই কথা পূর্ববর্তী শ্লোকেও *ভগবতোদিতঃ* শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে। ভগবানের নির্দেশ অভ্রান্ত, এবং তাঁর ফলও সর্বতোভাবে নিশ্চিত। তাঁর নির্দেশ অনুসারে ধর্মের আদর্শ রূপ হচ্ছে ভক্তিযোগ, যা এই শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভক্তিযোগ অনুশীলন করতে হলে প্রথমেই সদ্‌গুরু গ্রহণ করতে হয়। শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর *ভক্তিরসামৃতসিন্ধু* গ্রন্থে (১/২/৭৪-৭৫) উপদেশ দিয়েছেন—

গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্ ।
বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্ ॥
সদ্ধর্মপৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে ।

মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সদ্‌গুরু গ্রহণ করা। শিষ্যের কর্তব্য ঐকান্তিভাবে জিজ্ঞাসু হওয়া; তার কর্তব্য সনাতন ধর্মের বিষয়ে জানবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী হওয়া। *গুরুশুশ্রূষয়া* পদটির অর্থ হচ্ছে শ্রীগুরুদেবের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে সেবা করা, অর্থাৎ তাঁকে স্নান করতে, বস্ত্র পরিধান করতে, আহার করতে, নিদ্রা যেতে, এবং তাঁর অন্যান্য কার্যে সাহায্য করা উচিত। একে বলা হয় *গুরুশুশ্রূষণম্*। শিষ্যের কর্তব্য ভৃত্যের মতো শ্রীগুরুদেবের সেবা করা এবং তার কাছে যা কিছু রয়েছে তা সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করা। *প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়াবাচা*। সকলেরই প্রাণ রয়েছে, ধন রয়েছে, বুদ্ধি রয়েছে, এবং বাণী রয়েছে, এবং এই সবই শ্রীগুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানকে নিবেদন করতে হয়। কর্তব্যরূপে শ্রীগুরুদেবকে সব কিছু নিবেদন করতে হয়, এবং শ্রীগুরুদেবকে সেই নিবেদন সর্বান্তঃকরণে করা উচিত—কৃত্রিমভাবে জড় প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য নয়। এই নিবেদনকে বলা হয় অর্পণ। অধিকন্তু, ভগবদ্ভক্তির যথাযথ আচার-আচরণ শিক্ষার জন্য ভক্ত এবং সাধুদের সঙ্গে বাস করা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, শ্রীগুরুদেবকে যা কিছু নিবেদন করা হয়

তা প্রেম এবং অনুরাগ সহকারে করা উচিত, জড় প্রশংসা লাভের জন্য নয়। তেমনই, ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই সম্বন্ধে বিচার করাও অবশ্য কর্তব্য। প্রকৃতপক্ষে, সাধুর আচরণ সাধুসদৃশ হওয়া কর্তব্য (*সাধবঃ সদাচারাঃ)।* আদর্শ আচরণে আগ্রহশীল না হলে, তিনি সাধু পদের উপযুক্ত হন না। তাই বৈষ্ণবকে বা সাধুকে আদর্শ সদাচার সর্বতোভাবে অবলম্বন করা উচিত। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলেছেন যে, দীক্ষাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্তব্য, অর্থাৎ তাঁর সেবা করা এবং তাঁর বন্দনা করা কর্তব্য। কিন্তু যদি কেউ সঙ্গ করার উপযুক্ত না হয়, তা হলে তার সঙ্গ করা উচিত নয়।

শ্লোক ৩২

হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু ভগবানাস্ত ঈশ্বরঃ ।
ইতি ভূতানি মনসা কামৈস্তৈঃ সাধু মানয়েৎ ॥ ৩২ ॥

হরিঃ—পরমেশ্বর ভগবান; **সর্বেষু**—সমস্ত; **ভূতেষু**—জীবের; **ভগবান্**—পরম পুরুষ; **আস্তে**—অবস্থিত; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **ইতি**—এইভাবে; **ভূতানি**—সমস্ত জীব; **মনসা**—সেই কথা জেনে; **কামৈঃ**—বাসনার দ্বারা; **তৈঃ**—সেই; **সাধু মানয়েৎ**—প্রচুর সম্মান করা উচিত।

অনুবাদ

প্রতিটি জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করা উচিত। এইভাবে প্রতিটি জীবকে তার স্থিতি অনুসারে সম্মান করা উচিত।

তাৎপর্য

হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু। এই উক্তিটির কদর্থ করে অসৎ ব্যক্তিরা কখনও কখনও বলে যে, ভগবান শ্রীহরি যেহেতু প্রতিটি জীবের মধ্যে অবস্থিত, তাই প্রতিটি জীবই শ্রীহরি। এই প্রকার মূর্খ ব্যক্তিরা আত্মা এবং পরমাত্মার পার্থক্য অবগত নয়। আত্মা হচ্ছে জীব, এবং পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবান। জীবাত্মা সর্ব অবস্থাতেই পরমাত্মা ভগবান থেকে ভিন্ন। তাই *হরিঃ সর্বেষু ভূতেষু* পদটির অর্থ হচ্ছে যে, শ্রীহরি প্রতিটি জীবের অন্তরে পরমাত্মারূপে বিরাজমান—জীবাত্মারূপে নন। যদিও আত্মা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ। প্রতিটি জীবকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার অর্থ হচ্ছে প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান পরমাত্মাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করা। কখনও প্রতিটি জীবকে

পরমাত্মা বলে ভুল করা উচিত নয়। কখনও কখনও অসৎ ব্যক্তিরা কোন জীবকে দরিদ্র-নারায়ণ, স্বামী-নারায়ণ, অমুক নারায়ণ অথবা তমুক নারায়ণরূপে আখ্যা দেয়। কিন্তু মানুষের স্পষ্টভাবে জানা উচিত যে, নারায়ণ যদিও প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, তবুও জীব কখনও নারায়ণ হয় না।

শ্লোক ৩৩

এবং নির্জিতষড়্বর্গৈঃ ক্রিয়তে ভক্তিরীশ্বরে ।
বাসুদেবে ভগবতি যয়া সংলভ্যতে রতিঃ ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **নির্জিত**—দমন করে; **ষড়্বর্গৈঃ**—ইন্দ্রিয়ের ছয়টি লক্ষণ (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য) দ্বারা; **ক্রিয়তে**—করা হয়; **ভক্তিঃ**—ভক্তি; **ঈশ্বরে**—পরম নিয়ন্তা; **বাসুদেবে**—শ্রীবাসুদেবকে; **ভগবতি**—ভগবান; **যয়া**—যার দ্বারা; **সংলভ্যতে**—লাভ হয়; **রতিঃ**—আসক্তি।

অনুবাদ

এই সমস্ত কার্যকলাপের দ্বারা মানুষ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য—এই ষড়্রিপুকে জয় করে ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে সক্ষম হন। এইভাবে তিনি নিশ্চিতরূপে ভগবানের প্রেমময়ী সেবার স্তর প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্য

এই অধ্যায়ের ত্রিশ এবং একত্রিশ শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মানুষের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হয়ে তাঁর সেবা করা। প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন যে, জীবনের শুরু থেকেই, অর্থাৎ শৈশব অবস্থা থেকেই গুরুকুলে বাস করে শ্রীগুরুদেবের সেবা করার শিক্ষা লাভ করা উচিত (*কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞঃ*)। *ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বসন্দান্তো গুরোর্হিতম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১২/১)। এটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম স্তর। *গুরুপাদাশ্রয়ঃ সাধুবর্ত্মানুবর্তনম্, সদ্ধর্মপৃচ্ছা*। শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের উপদেশ অনুসরণ করে শিষ্য ভগবদ্ভক্তির স্তর লাভ করেন এবং তাঁর জড়-জাগতিক সম্পদের প্রতি অনাসক্ত হন। তাঁর যা কিছু সম্পদ সেই সবই শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করেন, যিনি তাঁকে *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ* এই পন্থায় যুক্ত করেন। শিষ্য নিষ্ঠা সহকারে তা অনুসরণ করেন এবং এইভাবে তিনি ইন্দ্রিয় দমন করতে শেখেন। তারপর, তাঁর বিশুদ্ধ

বুদ্ধির সাহায্যে তিনি ধীরে ধীরে ভগবানের প্রেমিকে পরিণত হন। সেই কথা প্রতিপন্ন করে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন, *আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ*। এইভাবে মানুষ পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর আসক্তি প্রকট হয়। তখন তিনি *ভাব* এবং *অনুভাব* অনুভব করে দিব্য আনন্দের স্তর প্রাপ্ত হন। সেই কথা পরবর্তী শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৩৪

নিশম্য কর্মাণি গুণানতুল্যান্
বীর্যাণি লীলাতনুভিঃ কৃতানি ।
যদাতিহর্ষোৎপুলকাশ্রুগদ্গদং
প্রোৎকণ্ঠ উদ্গায়তি রৌতি নৃত্যতি ॥ ৩৪ ॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **কর্মাণি**—দিব্য কার্যকলাপ; **গুণান্**—চিন্ময় গুণাবলী; **অতুল্যান্**—অসাধারণ (যা সাধারণ মানুষে দেখা যায় না); **বীর্যাণি**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **লীলা-তনুভিঃ**—তাঁর লীলা-বিলাসের বিভিন্ন রূপের দ্বারা; **কৃতানি**—অনুষ্ঠিত; **যদা**—যখন; **অতিহর্ষ**—অত্যন্ত আনন্দের ফলে; **উৎপুলক**—রোমাঞ্চ; **অশ্রু**—চোখের জল; **গদ্গদম্**—অবরুদ্ধ কণ্ঠ; **প্রোৎকণ্ঠঃ**—মুক্ত কণ্ঠে; **উদ্গায়তি**—উচ্চস্বরে কীর্তন করে; **রৌতি**—ক্রন্দন করে; **নৃত্যতি**—নৃত্য করে।

অনুবাদ

যে ব্যক্তি ভগবদ্ভক্তির স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি অবশ্যই তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বশীভূত করেছেন, এবং তার ফলে তিনি মুক্ত পুরুষ। এই প্রকার মুক্ত পুরুষ, বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্ত যখন লীলাবিলাস পরায়ণ ভগবানের বিবিধ অবতারের দিব্য গুণাবলী এবং অসাধারণ বীর্যবতী কার্যকলাপ শ্রবণ করেন, অত্যন্ত আনন্দবশত তাঁর শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। কখনও কখনও তিনি মুক্ত কণ্ঠে গান করেন, নৃত্য করেন এবং কখনও কখনও তিনি ক্রন্দন করেন। এইভাবে তিনি তাঁর দিব্য আনন্দ প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের কার্যকলাপ অসাধারণ। যেমন, তিনি যখন শ্রীরামচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তখন তিনি সমুদ্রে সেতুবন্ধনের মতো অসাধারণ কার্যকলাপ সম্পাদন

করেছিলেন। তেমনই, তিনি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হন, তখন তিনি গিরিগোবর্ধন ধারণ করেন, যদিও তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। এগুলি অসাধারণ কার্যকলাপ। মূর্খ এবং অসৎ ব্যক্তিরা ভগবানের এই সমস্ত অসাধারণ কার্যকলাপকে কাল্পনিক বলে মনে করে, কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত বা মুক্ত পুরুষ যখন ভগবানের এই সমস্ত অসাধারণ কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেন, তখন তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠেন এবং মুক্তকণ্ঠে কীর্তন করে, নৃত্য করে এবং উচ্চস্বরে রোদন করে দিব্য আনন্দের লক্ষণ প্রকাশ করেন। এটিই ভগবদ্ভক্ত এবং অভক্তের মধ্যে পার্থক্য।

শ্লোক ৩৫

যদা গ্রহগ্রস্ত ইব ক্বচিদ্ধস-
ত্যাক্রন্দতে ধ্যায়তি বন্দতে জনম্ ।
মুহুঃ শ্বসন্বক্তি হরে জগৎপতে
নারায়ণেত্যাত্মমতির্গতত্রপঃ ॥ ৩৫ ॥

যদা—যখন; **গ্রহ-গ্রস্তঃ**—পিশাচগ্রস্ত; **ইব**—মতো; **ক্বচিৎ**—কখনও; **হসতি**—হাসেন; **আক্রন্দতে**—উচ্চস্বরে ক্রন্দন করে (ভগবানের দিব্য গুণাবলী স্মরণ করেন); **ধ্যায়তি**—ধ্যান করেন, **বন্দতে**—শ্রদ্ধা নিবেদন করেন; **জনম্**—সমস্ত জীবদের (ভগবানের সেবায় যুক্ত বলে মনে করে); **মুহুঃ**—নিরন্তর; **শ্বসন্**—দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে; **বক্তি**—বলেন; **হরে**—হে ভগবান; **জগৎপতে**—হে জগৎপতি; **নারায়ণ**—হে নারায়ণ; **ইতি**—এইভাবে; **আত্মমতিঃ**—ভগবানের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়ে; **গত-ত্রপঃ**—নির্লজ্জ।

অনুবাদ

ভক্ত যখন গ্রহগ্রস্ত ব্যক্তির মতো হয়ে যান, তখন তিনি হাসেন, উচ্চস্বরে ভগবানের গুণাবলী কীর্তন করেন, কখনও তিনি ধ্যান করেন, প্রতিটি জীবকে ভগবানের সেবায় যুক্ত বলে মনে করে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, নিরন্তর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন, সামাজিক শিষ্টাচার গ্রাহ্য না করে পাগলের মতো উচ্চস্বরে "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ! হে ভগবান, হে জগৎপতে!" এইভাবে বলতে থাকেন।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন আনন্দে মগ্ন হয়ে, সামাজিক শিষ্টাচারের অপেক্ষা না করে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন, তখন বুঝতে হবে তিনি *আত্মমতি* হয়েছেন। অর্থাৎ, তাঁর চেতনা ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

তদা পুমান্ মুক্তসমস্তবন্ধন-
স্তদ্ভাবভাবানুকৃতাশয়াকৃতিঃ ।
নির্দগ্ধবীজানুশয়ো মহীয়সা
ভক্তিপ্রয়োগেণ সমেত্যধোক্ষজম্ ॥ ৩৬ ॥

তদা—তখন; **পুমান্**—জীব; **মুক্ত**—মুক্ত; **সমস্ত-বন্ধনঃ**—ভক্তিপথের সমস্ত প্রতিবন্ধক থেকে; **তদ্ভাব**—ভগবানের কার্যকলাপের স্থিতির; **ভাব**—চিন্তার দ্বারা; **অনুকৃত**—সেই রকম করে; **আশয়-আকৃতিঃ**—যাঁর মন এবং দেহ; **নির্দগ্ধ**—সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ; **বীজ**—জড় অস্তিত্বের মূল কারণ বা বীজ; **অনুশয়ঃ**—বাসনা; **মহীয়সা**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **ভক্তি**—ভগবদ্ভক্তির; **প্রয়োগেণ**—প্রয়োগের দ্বারা; **সমেতি**—প্রাপ্ত হন; **অধোক্ষজম্**—জড় মন এবং জ্ঞানের অতীত ভগবানকে।

অনুবাদ

নিরন্তর ভগবানের লীলা স্মরণ করার ফলে, ভক্তের মন এবং শরীর তখন সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তির ফলে তাঁর অজ্ঞান, জড় চেতনা এবং সর্বপ্রকার জড় বাসনা ভস্মীভূত হয়ে যায়। এই স্তরে মানুষ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় লাভ করতে পারে।

তাৎপর্য

ভক্ত যখন সম্পূর্ণভাবে পবিত্র হন, তখন তিনি *অন্যাভিলাষিতাশূন্য* হন, অর্থাৎ তখন তাঁর সমস্ত জড় বাসনা সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়ে যায়, এবং তিনি তখন ভগবানের দাস, সখা, পিতা-মাতা অথবা প্রেয়সীরূপে অবস্থিত হন। নিরন্তর এইভাবে চিন্তা করার ফলে তাঁর জড় শরীর এবং মন সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং জড় শরীরের আবশ্যকতাগুলি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। অগ্নির সংযোগে লৌহশলাকা

যেমন তপ্ত হতে হতে লাল হয়ে যায় এবং তখন আর সেটি লোহা থাকে না, আগুনে পরিণত হয়, তেমনই ভক্ত যখন তাঁর মূল কৃষ্ণভাবনায় নিরন্তর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন এবং ভগবানের কথা চিন্তা করেন, তখন তাঁর সমস্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপ সমাপ্ত হয়ে যায়, কারণ তাঁর শরীর তখন চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রগতি অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং তাই সেই প্রকার ভক্ত তাঁর জীবদ্দশাতেই ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। ভগবদ্ভক্তের এই দিব্য আনন্দময় স্থিতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণরূপে প্রদর্শন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল মধ্বাচার্য লিখেছেন—

তদ্ভাবভাবঃ তদ্‌যথা স্বরূপং ভক্তিঃ ।
কেচিদ্‌ভক্তা বিনৃত্যন্তি গায়ন্তি চ যথেঙ্গিতম্ ।
কেচিত্তূষ্ণীং জপন্ত্যেব কেচিৎ শোভয়কারিণঃ ॥

ভগবদ্ভক্তের এই আনন্দময় স্থিতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি কখনও নাচতেন, কখনও ক্রন্দন করতেন, কখনও গান করতেন, কখনও মৌন হয়ে থাকতেন, এবং কখনও ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতেন। সেটিই চিন্ময় অস্তিত্বের পূর্ণতম অবস্থা।

শ্লোক ৩৭

অধোক্ষজালম্ভমিহাশুভাত্মনঃ
শরীরিণঃ সংসৃতিচক্রশাতনম্ ।
তদ্ ব্রহ্মনির্বাণসুখং বিদুর্বুধা-
স্ততো ভজধ্বং হৃদয়ে হৃদীশ্বরম্ ॥ ৩৭ ॥

অধোক্ষজ—জড় মন অথবা ব্যবহারিক জ্ঞানের অতীত ভগবানের; **আলম্ভম্**—নিরন্তর সম্পর্কযুক্ত হয়ে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **অশুভ-আত্মনঃ**—যার মন জড় কলুষের দ্বারা কলুষিত; **শরীরিণঃ**—দেহধারী জীবের; **সংসৃতি**—সংসারের; **চক্র**—চক্র; **শাতনম্**—নিবৃত্ত করে; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম-নির্বাণ**—পরম সত্য পরম ব্রহ্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে; **সুখম্**—চিন্ময় আনন্দ; **বিদুঃ**—জানতে পারে; **বুধাঃ**—আধ্যাত্মিক চেতনায় উন্নত ব্যক্তিগণ; **ততঃ**—অতএব; **ভজধ্বম্**—ভগবদ্ভক্তিতে যুক্ত; **হৃদয়ে**—অন্তরের অন্তস্তলে; **হৃদীশ্বরম্**—অন্তর্যামী ভগবানকে।

অনুবাদ

জীবনের প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে জন্ম-মৃত্যুর চক্র। কিন্তু জীব যখন ভগবানের সংস্পর্শে আসে, তখন এই চক্রের গতি সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হয়। অর্থাৎ, ভগবদ্ভক্তিতে নিরন্তর মগ্ন থাকার ফলে যে দিব্য আনন্দ আস্বাদন হয়, তার ফলে জীব এই সংসার থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে যায়। সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সেই কথা জানেন। অতএব, হে বন্ধুগণ, হে দৈত্যনন্দনগণ, তোমরা তোমাদের অন্তরের অন্তস্তলে সেই অন্তর্যামী পরমেশ্বরের ধ্যান করে তাঁর আরাধনা কর।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষেরা মনে করে যে, পরম সত্যের নির্বিশেষ রূপ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ফলে পূর্ণরূপে সুখী হওয়া যায়। *ব্রহ্ম-নির্বাণ* শব্দ দুটি পরম সত্যকে ইঙ্গিত করে, যিনি তিনরূপে উপলব্ধ হন—*ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে*। ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ফলে ব্রহ্মসুখ অনুভব করা যায়, কারণ ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে ভগবানের দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। *যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটি*। *যস্য প্রভা*, অর্থাৎ নির্বিশেষ ব্রহ্ম হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় দেহের জ্যোতি। তাই ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়ার ফলে যে চিন্ময় আনন্দ অনুভব হয়, তার কারণ শ্রীকৃষ্ণের সংস্পর্শ। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কই পূর্ণ ব্রহ্মসুখ। মন যখন নির্বিশেষ ব্রহ্মের সংস্পর্শে থাকে তখন জীব প্রসন্ন হয়, কিন্তু তাঁকে আরও উন্নতি সাধন করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হতে হয়, কারণ ব্রহ্মজ্যোতিতে মগ্ন হয়ে থাকার নিশ্চয়তা নেই। সেই সম্বন্ধে বলা হয়েছে, *আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ*। কেউ পরম সত্যের ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যেতে পারে, কিন্তু অধোক্ষজ বা বাসুদেবের সঙ্গে পরিচিত না হওয়ার ফলে অধঃপতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ব্রহ্মসুখ অবশ্য নিঃসন্দেহে জড় সুখের নিবৃত্তি সাধন করে, কিন্তু কেউ যখন নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা উপলব্ধির স্তর অতিক্রম করে ভগবানের সঙ্গে দাস, সখা, পিতা-মাতা অথবা প্রেয়সীরূপে সম্পর্কযুক্ত হন, তখন তাঁর সুখ সর্বব্যাপ্ত হয়। তখন চন্দ্রের উজ্জ্বল কিরণ দর্শন করার মতো আপনা থেকেই দিব্য আনন্দ অনুভূত হয়। চন্দ্র দর্শন করলে স্বাভাবিকভাবে সুখের অনুভব হয়, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করলে যে দিব্য আনন্দ অনুভব হয়, সেই আনন্দ পূর্ণচন্দ্র দর্শনের আনন্দ থেকে শত-সহস্রগুণ অধিক। কেউ যখন অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হন, তখন তিনি নিঃসন্দেহে সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হন। *যা নির্বৃতস্তনুভৃতাম্*। সমস্ত জড় সুখের নিবৃত্তিকে বলা হয় *নির্বৃতি* বা *নির্বাণ*।

শ্রীল রূপ গোস্বামী *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে* (১/১/৩৮) বলেছেন—

ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎ পরার্ধগুণীকৃতঃ ।
নৈতি ভক্তিসুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥

"ব্রহ্মজ্যোতিতে লীন হয়ে যাওয়ার ফলে যে ব্রহ্মানন্দ অনুভব হয়, তার অর্বুদ অর্বুদগুণ অধিক আনন্দও ভগবদ্ভক্তির আনন্দের এক কণিকার তুল্যও নয়।"

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥

"যিনি এইভাবে চিন্ময় ভাব লাভ করেছেন, তিনি পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করেছেন। তিনি কখনই কোন কিছুর জন্য শোক করেন না বা কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করেন না; তিনি সমস্ত জীবের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন। সেই অবস্থায় তিনি আমার শুদ্ধ ভক্তি লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৫৪) কেউ যদি ব্রহ্ম-নির্বাণের স্তর থেকে আরও অগ্রসর হন, তা হলে তিনি ভগবদ্ভক্তির স্তরে প্রবেশ করবেন (*মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্*)। *অধোক্ষজালম্ভম্* শব্দটির অর্থ মন এবং মনোধর্মী জল্পনা-কল্পনার অতীত পরম সত্যের সঙ্গে সর্বদা মনকে যুক্ত রাখা। *স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ* । এটিই শ্রীবিগ্রহ আরাধনার ফল। সর্বদা ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার ফলে এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের কথা ধ্যান করার ফলে, আপনা থেকেই সমস্ত জড় কলুষ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তাই *ব্রহ্মনির্বাণসুখম্* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, কেউ যখন পরম সত্যের সংস্পর্শে আসেন, তখন তাঁর জড় সুখভোগের সমস্ত বাসনা সর্বতোভাবে নিবৃত্ত হয়।

শ্লোক ৩৮

কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরে-
রুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ ।
স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুরশেষদেহিনাং
সামান্যতঃ কিং বিষয়োপপাদনৈঃ ॥ ৩৮ ॥

কঃ—কি; **অতিপ্রয়াসঃ**—কঠিন প্রচেষ্টা; **অসুর-বালকাঃ**—হে দৈত্যনন্দনগণ; **হরেঃ**—ভগবানের; **উপাসনে**—প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনে; **স্বে**—নিজের; **হৃদি**—হৃদয়ে; **ছিদ্রবৎ**—আকাশের মতো; **সতঃ**—বর্তমান; **স্বস্য**—নিজের অথবা জীবের; **আত্মনঃ**—পরমাত্মার; **সখ্যুঃ**—শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর; **অশেষ**—অসীম; **দেহিনাম্**—

দেহধারী জীবদের; **সামান্যতঃ**—সাধারণত; **কিম্**—কি প্রয়োজন; **বিষয়-উপপাদনৈঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের কার্যকলাপের।

অনুবাদ

হে বন্ধুগণ! হে অসুর বালকগণ! পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদাই সমস্ত জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সমস্ত জীবের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং বন্ধু, এবং তাঁর উপাসনায় কোন অসুবিধা নেই। তা হলে লোকেরা কেন তাঁর প্রতি ভক্তিপরায়ণ হয় না? কেন তারা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কৃত্রিম আয়োজনের চেষ্টায় অনর্থক আসক্ত হয়?

তাৎপর্য

ভগবান যেহেতু পরম, তাই কেউ তাঁর সমান নয় এবং তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। কিন্তু তা হলেও কেউ যদি ভগবানের ভক্ত হন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবানকে লাভ করতে পারেন। ভগবানকে আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ আকাশ বিশাল হলেও সকলেরই, কেবল মানুষদেরই নয়, পশুদেরও আয়ত্তের মধ্যে। পরমাত্মারূপে ভগবান প্রতিটি জীবের সর্বশ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সুহৃদরূপে বিরাজ করেন। *বেদে* বলা হয়েছে *সযুজৌ সখায়ৌ*। পরমাত্মারূপে ভগবান সর্বদা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজ করেন। ভগবান জীবের এমনই বন্ধু যে, তিনি তাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন যাতে তারা সর্বদা তাঁর সঙ্গে অনায়াসে যোগাযোগ রাখতে পারে। ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে তা সহজেই সম্ভব (*শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্*)। ভগবানের কথা (*কৃষ্ণকীর্তন*) শ্রবণ করা মাত্রই ভগবানের সান্নিধ্য লাভ হয়। ভগবদ্ভক্তির যে কোন একটি অথবা সব কয়টি অঙ্গের দ্বারা ভক্ত তৎক্ষণাৎ ভগবানের সংস্পর্শে আসতে পারেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্ ।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥

তাই ভগবানের সংস্পর্শে আসা একেবারেই কঠিন নয় (*কোঽতিপ্রয়াসঃ*)। পক্ষান্তরে, নরকে যাওয়ার জন্য অনেক প্রচেষ্টা করতে হয়। কেউ যদি অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ আহার, দ্যূতক্রীড়া এবং আসবপান করার মাধ্যমে নরকে যেতে চায়, তা হলে তাকে কত আয়োজন করতে হয়। অবৈধ যৌনসঙ্গ করার উদ্দেশ্যে বেশ্যালয়ে যাওয়ার জন্য তাকে অর্থের আয়োজন করতে হয়, আমিষ আহারের জন্য তাকে কসাইখানার বন্দোবস্ত করতে হয়। জুয়া খেলার জন্য তাকে ক্যাসিনো এবং হোটেলের ব্যবস্থা

করতে হয়, এবং আসব পানের জন্য তাকে চোলাই মদের কারখানা খুলতে হয়। তাই, স্পষ্টভাবেই বোঝা যায় যে, কেউ যদি নরকে যেতে চায়, তা হলে তাকে কত রকম প্রচেষ্টা করতে হয়, কিন্তু কেউ যদি ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চান, তা হলে তাঁকে কোন রকম কঠিন প্রয়াস করার আবশ্যকতা হয় না। ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য তিনি একাকী যে কোন স্থানে, যে কোনও অবস্থায়, বসবাস করতে পারেন, এবং কেবলমাত্র আসনে উপবিষ্ট হয়ে পরমাত্মার ধ্যান করে ভগবানের মহিমা কীর্তন এবং শ্রবণ করতে পারেন। এইভাবে ভগবানের সমীপবর্তী হতে কোনই অসুবিধা হয় না। *অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রম্*। জীব তার ইন্দ্রিয়গুলি সংযত করতে না পারার ফলে নরকে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত কঠোর প্রচেষ্টা করে, কিন্তু কেউ যদি বিচক্ষণ হন, তা হলে তিনি অনায়াসে ভগবানের কৃপা লাভ করতে পারেন। কারণ ভগবান সর্বদা তাঁর সঙ্গে রয়েছেন। *শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ*, এই অতি সরল পন্থার দ্বারা ভগবান প্রসন্ন হন। বস্তুতপক্ষে ভগবান বলেছেন—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥

"যে বিশুদ্ধচিত্ত নিষ্কাম ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্বক পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পণ করেন, আমি তাঁর সেই ভক্তিপ্লুত উপহার প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/২৬) মানুষ যে কোন স্থানে ভগবানের ধ্যান করতে পারে। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর বন্ধু দৈত্যনন্দনদেরকে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার অতি সরল পন্থাটি অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন ।

শ্লোক ৩৯

রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো
গৃহা মহী কুঞ্জরকোশভৃতয়ঃ ।
সর্বেঽর্থকামাঃ ক্ষণভঙ্গুরায়ুষঃ
কুর্বন্তি মর্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ ॥ ৩৯ ॥

রায়ঃ—ধন সম্পদ; **কলত্রম্**—পত্নী এবং বান্ধবী; **পশবঃ**—গরু, ঘোড়া, গর্দভ, বিড়াল, কুকুর আদি গৃহপালিত পশু; **সুত-আদয়ঃ**—সন্তান ইত্যাদি; **গৃহাঃ**—বড় বড় বাড়ি এবং বাসগৃহ; **মহী**—ভূমি; **কুঞ্জর**—হস্তী; **কোশ**—ধনাগার; **ভৃতয়ঃ**—ইন্দ্রিয়তৃপ্তি এবং ভোগবিলাসের অন্যান্য সামগ্রী; **সর্বে**—সমস্ত; **অর্থ**—অর্থনৈতিক

উন্নতি; **কামাঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ; **ক্ষণ-ভঙ্গুর**—যে কোন মুহূর্তে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে; **আয়ুষঃ**—আয়ুর; **কুর্বন্তি**—করে অথবা নিয়ে আসে; **মর্ত্যস্য**—মরণশীল ব্যক্তির; **কিয়ৎ**—কতখানি; **প্রিয়ম্**—আনন্দ; **চলাঃ**—অস্থির এবং ক্ষণস্থায়ী।

অনুবাদ

মানুষের ধন, সুন্দরী স্ত্রী এবং বান্ধবী, পুত্র-কন্যা, গৃহ, ভূমি, গাভী, হস্তী, অশ্ব আদি গৃহপালিত পশু, ধনাগার, অর্থ এবং কাম, এমন কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য ভোগ করার পরমায়ু সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর এবং অস্থির। যেহেতু মনুষ্য-জীবন অনিত্য, অতএব যে ব্যক্তি বুঝতে পেরেছেন যে তিনি নিত্য, সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিকে কি এই সমস্ত জড় ঐশ্বর্য সুখ প্রদান করতে পারে?

তাৎপর্য

এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের সমর্থকেরা কিভাবে প্রকৃতির নিয়মে নিরাশ হয়। পূর্ববর্তী শ্লোকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, *কিং বিষয়োপপাদনৈঃ*—তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ফলে কি লাভ হয়? পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে যে, জড় সভ্যতার উন্নতির মাধ্যমে দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের দ্বারা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির অনিবার্য সমস্যার কোন সমাধান হয় না। পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করার মাধ্যমে সকলেই দেখতে পায় যে, রোম সাম্রাজ্য, মোঘল সাম্রাজ্য, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ইত্যাদি পৃথিবীর বড় বড় সাম্রাজ্যগুলি কেবল অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্যই ব্যস্ত ছিল (*সর্বেঽর্থকামাঃ*), কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির দ্বারা প্রকৃতির নিয়মে সেগুলি একে একে ধ্বংস হয়ে গেছে। এইভাবে তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাই ক্ষণভঙ্গুর। তাই এই শ্লোকে বলা হয়েছে, *কুর্বন্তি মর্ত্যস্য কিয়ৎ প্রিয়ং চলাঃ*—কেউ বিশাল সাম্রাজ্য অধিকার করার গর্বে গর্বিত হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত সাম্রাজ্য অনিত্য; একশ-দুশো বছর পর সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। এই ধরনের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন যদিও কঠোর পরিশ্রমের ফলে লাভ হয়, কিন্তু তা অতি শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যায়। তাই সেগুলিকে *চলাঃ* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বুদ্ধিমান মানুষের তাই বোঝা উচিত যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন মোটেই সুখদায়ক নয়। *ভগবদ্গীতায়* এই জড় জগৎকে *দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে—তা দুঃখময় এবং অনিত্য। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন কিছুকালের জন্য সুখকর হতে পারে, কিন্তু তা স্থায়ী হয় না। তার ফলে এখন বড় বড় সমস্ত ব্যবসায়ীরা অত্যন্ত

বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে, কারণ ধন অপহরণকারী সরকারগুলি তাদের উত্ত্যক্ত করছে। অতএব যা চিরস্থায়ী নয় এবং আত্মার জন্য সুখকর নয়, সেই তথাকথিত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য মানুষ কেন তার সময় নষ্ট করবে?

পক্ষান্তরে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য। *নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম*। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ আত্মার প্রেম নিত্য, এবং দাস, সখা, পিতা-মাতা অথবা প্রেয়সীরূপে এই নিত্য প্রেম পুনর্জাগরিত করা মোটেই কঠিন নয়। বিশেষ করে এই যুগে এক অপূর্ব সুন্দর সুযোগ দেওয়া হয়েছে—মানুষ কেবল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র (*হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্*) কীর্তন করার ফলে, ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করতে পারে, এবং তার ফলে সে এত সুখী হতে পারে যে, তখন সে আর এই জড় জগতের কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে না। সেই সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—*ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে*। অতি উন্নত স্তরের কৃষ্ণভক্ত কখনও ধন-সম্পদ, অনুগামী অথবা প্রতিষ্ঠা কামনা করেন না। *রায়ঃ কলত্রং পশবঃ সুতাদয়ো গৃহা মহী কুঞ্জরকোশভূতয়ঃ*। যে সমস্ত কুকুর এবং শূকরেরা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করতে পারে না, তাদেরও জড় ঐশ্বর্যজাত সুখ লাভ হয়, যদিও তা ভিন্ন মানের। কিন্তু মনুষ্য-জীবনে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের সুপ্ত, শাশ্বত সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করা সম্ভব। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ এই জীবনকে *অর্থদম্* বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব আমরা যদি অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের অর্থহীন প্রচেষ্টায় আমাদের সময়ের অপচয় করার পরিবর্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করার চেষ্টা করি, তা হলে আমাদের জীবন সফল হবে।

শ্লোক ৪০

এবং হি লোকাঃ ক্রতুভিঃ কৃতা অমী
ক্ষয়িষ্ণবঃ সাতিশয়া ন নির্মলাঃ ।
তস্মাদদৃষ্টশ্রুতদূষণং পরং
ভক্ত্যোক্তয়েশং ভজতাত্মলব্ধয়ে ॥ ৪০ ॥

এবম্—তেমনই (জাগতিক ধন-সম্পদ যেমন অনিত্য); **হি**—বস্তুতপক্ষে; **লোকাঃ**—স্বর্গলোক, চন্দ্রলোক, সূর্যলোক, ব্রহ্মলোক আদি উচ্চতর লোক; **ক্রতুভিঃ**—মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা; **কৃতাঃ**—প্রাপ্ত; **অমী**—সেই সব; **ক্ষয়িষ্ণবঃ**—নশ্বর, অনিত্য; **সাতিশয়াঃ**—যদিও অধিক আরামদায়ক এবং সুখকর;

ন—না; **নির্মলাঃ**—শুদ্ধ (উপদ্রব রহিত); **তস্মাৎ**—অতএব; **অদৃষ্ট-শ্রুত**—যা কখনও দেখা যায়নি অথবা শোনা যায়নি; **দূষণম্**—যার ত্রুটি; **পরম্**—পরম; **ভক্ত্যা**—অত্যন্ত ভক্তি সহকারে; **উক্তয়া**—বৈদিক শাস্ত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে (জ্ঞান অথবা কর্ম মিশ্রিত নয়); **ঈশম্**—ভগবানকে; **ভজত**—আরাধনা কর; **আত্ম-লব্ধয়ে**—আত্ম-উপলব্ধির জন্য।

অনুবাদ

বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়। কিন্তু, স্বর্গলোকের জীবন যদিও এই পৃথিবীর জীবন থেকে শত-সহস্রগুণ অধিক সুখকর, তবুও স্বর্গলোক শুদ্ধ (নির্মলম্) অথবা জড় অস্তিত্বের ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। স্বর্গলোকও অনিত্য, এবং তাই সেই লোক প্রাপ্ত হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু ভগবানের মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি কেউ কখনও দেখেনি বা শোনেনি। তাই, তোমাদের কর্তব্য তোমাদের প্রকৃত লাভের জন্য এবং আত্ম উপলব্ধির জন্য শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে পরম ভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করা।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, *ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি* । কেউ যদি মহান যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গলোকে উন্নীতও হন, তাঁর সেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান এমনিতেই পশুবলির ফলে পাপপূর্ণ, এবং তা ছাড়া স্বর্গলোকের সুখও নিরঙ্কুশ নয়। দেবরাজ ইন্দ্রকেও জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। তাই স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েও বিশেষ কোন লাভ হয় না। আর তা ছাড়া, পুণ্যফল শেষ হয়ে গেলে স্বর্গলোক থেকে আবার এই মর্ত্যলোকে ফিরে আসতে হয়। *বেদে* বলা হয়েছে, *তদ্যথেহ কর্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত*। এই পৃথিবীতে যেমন কঠিন পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত উচ্চপদ কালক্রমে সমাপ্ত হয়ে যায়, তেমনই স্বর্গলোকে বাসের মেয়াদও কালক্রমে সমাপ্ত হয়ে যায়। জীব তার পুণ্যকর্মের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন স্তরের জীবন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তার কোনটিই চিরস্থায়ী নয়, এবং তাই সেগুলি অশুদ্ধ। তাই, পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য অথবা আরও নিম্নস্তরের নরকে অধঃপতিত হওয়ার জন্য স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়। এইভাবে ওপরে ওঠার এবং নিচে নামার চক্রাকারে আবর্তনের নিবৃত্তি সাধনের জন্য কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই বলেছেন—

ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব ।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯/১৫১)

জীব সংসার-চক্রে আবর্তিত হয়ে কখনও উচ্চলোকে উন্নীত হয় এবং কখনও নিম্নলোকে অধঃপতিত হয়, কিন্তু উপর্যধঃ ভ্রমণের ফলে জীবনের প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না। কিন্তু কেউ যদি সৌভাগ্যক্রমে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ লাভ করেন, তা হলে আত্ম-উপলব্ধি লাভ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটিই প্রকৃতপক্ষে বাঞ্ছনীয়। *ভজতাত্মলব্ধয়ে*—আত্ম-উপলব্ধির জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করা অবশ্য কর্তব্য।

শ্লোক ৪১

যদর্থ ইহ কর্মাণি বিদ্বন্মান্যসকৃন্নরঃ ।
করোত্যতো বিপর্যাসমমোঘং বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪১ ॥

যৎ—যার; **অর্থে**—উদ্দেশ্যে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **কর্মাণি**—বহু কার্যকলাপ (কলকারখানা, উদ্যোগ, মানসিক জল্পনা-কল্পনা ইত্যাদিতে); **বিদ্বৎ**—উন্নত জ্ঞান-সম্পন্ন; **মানী**—নিজেকে মনে করে; **অসকৃৎ**—বার বার; **নরঃ**—ব্যক্তি; **করোতি**—অনুষ্ঠান করে; **অতঃ**—এর থেকে; **বিপর্যাসম্**—বিপরীত; **অমোঘম্**—অব্যর্থ; **বিন্দতে**—প্রাপ্ত হয়; **ফলম্**—ফল।

অনুবাদ

জড় বিষয়াসক্ত ব্যক্তি নিজেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলে মনে করে, নিরন্তর অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কর্ম করে। কিন্তু বার বার বেদবিহিত সকাম কর্মের অনুষ্ঠান করে সে ইহলোকে অথবা পরলোকে নিরাশ হয়। প্রকৃতপক্ষে, সে তার বাঞ্ছিত ফল লাভ না করে তার বিপরীত ফল লাভ করে।

তাৎপর্য

জড়-জাগতিক কর্ম অনুষ্ঠানের দ্বারা কেউ কখনও তার বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারেনি। পক্ষান্তরে, সকলেই বার বার নিরাশ হয়েছে। তাই, এই জীবনে অথবা পরবর্তী জীবনে ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য জড়-জাগতিক কার্যকলাপে সময়ের অপচয়

করা উচিত নয়। কত জাতীয়তাবাদী, অর্থনীতিবিদ এবং অন্য উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিরা এককভাবে বা সমবেতভাবে সুখভোগের চেষ্টা করেছে, কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তারা সকলেই নিরাশ হয়েছে। আধুনিক যুগের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, কত রাজনৈতিক নেতারা ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কত কঠোর পরিশ্রম করেছে, কিন্তু তারা সকলেই ব্যর্থ হয়েছে। এটিই প্রকৃতির নিয়ম, যা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

শ্লোক ৪২

সুখায় দুঃখমোক্ষায় সঙ্কল্পঃ ইহ কর্মিণঃ ।
সদাপ্নোতীহয়া দুঃখমনীহায়াঃ সুখাবৃতঃ ॥ ৪২ ॥

সুখায়—তথাকথিত উচ্চতর স্তরের জীবনের মাধ্যমে সুখ লাভের জন্য; **দুঃখ-মোক্ষায়**—দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য; **সঙ্কল্পঃ**—সংকল্প; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মিণঃ**—অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে যত্নশীল জীবদের; **সদা**—সর্বদা; **আপ্নোতি**—প্রাপ্ত হয়; **ঈহয়া**—কর্ম বা উচ্চাভিলাষের দ্বারা; **দুঃখম্**—কেবল দুঃখ; **অনীহায়াঃ**—অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের বাসনা না করে; **সুখ**—সুখের দ্বারা; **আবৃতঃ**—আচ্ছাদিত।

অনুবাদ

এই জড় জগতে সমস্ত বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সুখ লাভের এবং দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টা করে, এবং সেই উদ্দেশ্যে কর্ম করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষ তখনই সুখী হয়, যখন সে সুখের জন্য কোন রকম চেষ্টা করে না। মানুষ যখনই সুখের জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে, তখনই তার দুঃখভোগ শুরু হয়।

তাৎপর্য

প্রতিটি বদ্ধ জীবই জড়া প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* বর্ণনা করা হয়েছে—*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ*। এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই ভগবানের নির্দেশ অনুসারে এক বিশেষ প্রকার জড় শরীর প্রাপ্ত হয়েছে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) পরমেশ্বর ভগবান বা পরমাত্মা সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং যখনই জীব বাসনা করে, তখনই ভগবান তাকে বিভিন্ন প্রকার শরীরের মাধ্যমে তার অভিলাষ অনুসারে কর্ম করার সুযোগ দেন। দেহটি ঠিক একটি যন্ত্রের মতো, যার দ্বারা জীব তার সুখভোগের ভ্রান্ত বাসনা অনুসারে ভ্রমণ করে, এবং তার ফলে জীবন ধারণের বিভিন্ন মান অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির দুঃখ ভোগ করতে থাকে। সকলেই কোন বিশেষ পরিকল্পনা এবং অভিলাষ নিয়ে তার কার্যকলাপ শুরু করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই পরিকল্পনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে কোন রকম সুখ লাভ করতে পারে না। পক্ষান্তরে, তার পরিকল্পনা অনুসারে কার্য করতে শুরু করা মাত্রই তার দুঃখময় জীবনের শুরু হয়। তাই, দুঃখময় জীবনের নিবৃত্তি সাধনের জন্য উৎসুক হওয়া উচিত নয়, কারণ সেই জন্য কেউই কিছু করতে পারে না। *অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে*। মানুষ যদিও তার ভ্রান্ত উচ্চ অভিলাষ অনুসারে কর্ম করে, তবু সে মনে করে যে, সে তার কার্যকলাপের দ্বারা তার জড়-জাগতিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারবে। *বেদে* নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, মানুষের সুখ বৃদ্ধির অথবা দুঃখ নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ তা অর্থহীন। *তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদঃ*। মানুষের আত্ম-উপলব্ধির জন্য কর্ম করা উচিত, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য নয়, যে উন্নতি সাধন অসম্ভব। কোন প্রচেষ্টা ব্যতীতই মানুষ তার ভাগ্যে যতখানি সুখ এবং দুঃখ লেখা রয়েছে তা লাভ করবে, এবং তার পক্ষে তা পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তাই কৃষ্ণভাবনামৃতের আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করাই কর্তব্য। তার মূল্যবান মনুষ্য-জীবনের সময়ের অপচয় করা উচিত নয়। তথাকথিত সুখের উচ্চাভিলাষ না করে, কৃষ্ণভাবনামৃতের উন্নতি সাধনের জন্য এই জীবনের সদ্ব্যবহার করাই শ্রেয়।

শ্লোক ৪৩

কামান্ কাময়তে কাম্যৈর্যদর্থমিহ পূরুষঃ ।
স বৈ দেহস্তু পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ ॥ ৪৩ ॥

কামান্—ইন্দ্রিয়ভোগের বিষয়; **কাময়তে**—মানুষ বাসনা করে; **কাম্যৈঃ**—বিবিধ কাম্য কর্মের দ্বারা; **যৎ**—যার; **অর্থম্**—উদ্দেশ্যে; **ইহ**—এই জড় জগতে; **পুরুষঃ**—জীব; **সঃ**—সেই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **দেহঃ**—দেহ; **তু**—কিন্তু; **পারক্যঃ**—অন্যদের (কুকুর,

শকুনি ইত্যাদি); **ভঙ্গুরঃ**—নশ্বর; **যাতি**—চলে যায়; **উপৈতি**—আত্মাকে আলিঙ্গন করে; **চ**—এবং।

অনুবাদ

জীব তার দেহসুখ কামনা করে এবং সেই উদ্দেশ্যে বহু পরিকল্পনা করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেহটি অন্যের সম্পত্তি। প্রকৃতপক্ষে, নশ্বর দেহটি জীবাত্মাকে আলিঙ্গন করে এবং তারপর তাকে ছেড়ে চলে যায়।

তাৎপর্য

সকলেই তার দেহসুখের কামনা করে এবং দেহটি যে শৃগাল, কুকুর অথবা কীটদের ভক্ষ্য এবং চরমে তা বিষ্ঠা, ভস্ম অথবা মাটিতে পরিণত হবে, সেই কথা ভুলে গিয়ে জীব তার দেহসুখের উপযুক্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য কত চেষ্টা করে। জীব প্রত্যেক জন্মে একের পর এক শরীরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য জড় সম্পদ লাভের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তার সময়ের অপচয় করে।

শ্লোক ৪৪

কিমু ব্যবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ ।
রাজ্যকোশগজামাত্যভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ ॥ ৪৪ ॥

কিম্ উ—কি বলার আছে; **ব্যবহিত**—পৃথক; **অপত্য**—সন্তান; **দার**—পত্নী; **অগার**—বাসস্থান; **ধন**—সম্পদ; **আদয়ঃ**—ইত্যাদি; **রাজ্য**—রাজ্য; **কোশ**—ধনভাণ্ডার; **গজ**—হাতি-ঘোড়া; **অমাত্য**—মন্ত্রী; **ভৃত্য**—সেবক; **আপ্তাঃ**—আত্মীয়স্বজন; **মমতা-আস্পদাঃ**—ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ('মমতার') ভ্রান্ত আসন বা আলয়।

অনুবাদ

যেহেতু দেহটি চরমে বিষ্ঠা অথবা মাটিতে পরিণত হবে, তখন দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত পত্নী, গৃহ, ধন, সন্তান, আত্মীয়, ভৃত্য, বন্ধু, রাজ্য, কোষাগার, পশু, মন্ত্রী ইত্যাদির কি প্রয়োজন? সেই সবই অনিত্য। সেই সম্বন্ধে অধিক কি বলার আছে?

শ্লোক ৪৫

কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ ।
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ ॥ ৪৫ ॥

কিম্—কি প্রয়োজন; **এতৈঃ**—এই সবের; **আত্মনঃ**—আত্মার; **তুচ্ছৈঃ**—যা নিতান্তই নগণ্য; **সহ**—সঙ্গে; **দেহেন**—দেহ; **নশ্বরৈঃ**—বিনাশশীল; **অনর্থৈঃ**—অবাঞ্ছিত; **অর্থ-সংকাশৈঃ**—আবশ্যক বলে মনে হলেও; **নিত্য-আনন্দ**—নিত্য আনন্দের; **রস**—অমৃতের; **উদধেঃ**—সমুদ্রের জন্য।

অনুবাদ

যতক্ষণ দেহের অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই এই সমস্ত বস্তু অত্যন্ত প্রিয় বলে মনে হয়, কিন্তু দেহ বিনষ্ট হয়ে যাওয়া মাত্রই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত এই সমস্ত বস্তুগুলির আর অস্তিত্ব থাকে না। তাই, প্রকৃতপক্ষে এগুলির কোন প্রয়োজন নেই, কিন্তু অবিদ্যার ফলে সেগুলি অনর্থ হলেও অর্থের মতো প্রতীত হয়। নিত্য আনন্দ-রসের সমুদ্রের তুলনায় সেগুলি অত্যন্ত তুচ্ছ। নিত্য আত্মার এই প্রকার তুচ্ছ সম্পর্কের কি প্রয়োজন?

তাৎপর্য

কৃষ্ণভাবনামৃত অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তি এক নিত্য আনন্দের সমুদ্র। সেই নিত্য আনন্দের তুলনায় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে যে তথাকথিত সুখ, তা নিতান্তই অর্থহীন এবং নগণ্য। তাই মানুষের কর্তব্য এই সমস্ত অনিত্য বস্তুর প্রতি আসক্ত না হয়ে, কৃষ্ণভাবনামৃতের পন্থা অবলম্বন করে নিত্য আনন্দ লাভ করা।

শ্লোক ৪৬

নিরূপ্যতামিহ স্বার্থঃ কিয়ান্ দেহভৃতোঽসুরাঃ ।
নিষেকাদিষ্ববস্থাসু ক্লিশ্যমানস্য কর্মভিঃ ॥ ৪৬ ॥

নিরূপ্যতাম্—নিরূপিত হোক; **ইহ**—এই জগতে; **স্ব-অর্থঃ**—স্বীয় লাভ; **কিয়ান্**—কতখানি; **দেহ-ভৃতঃ**—জড় দেহধারী জীবের; **অসুরাঃ**—হে অসুর-বালকগণ; **নিষেক-আদিষু**—মৈথুন আদি সুখ থেকে; **অবস্থাসু**—অনিত্য অবস্থায়; **ক্লিশ্যমানস্য**—কঠোর দুঃখ-দুর্দশায় ক্লিষ্ট; **কর্মভিঃ**—পূর্বকৃত কর্মের দ্বারা।

অনুবাদ

হে অসুরনন্দন বন্ধুগণ, জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর প্রাপ্ত হয়। তার ফলে গর্ভে প্রবেশ থেকে শুরু করে তার বিশেষ শরীরের সমস্ত অবস্থাতেই তাকে নানা প্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। তাই, পূর্ণরূপে বিবেচনা করে তোমরাই বল, যে সকাম কর্ম চরমে কেবল দুঃখ-দুর্দশাই প্রদান করে, তা অনুষ্ঠান করে কি লাভ?

তাৎপর্য

কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তুর্দেহোপপত্তয়ে। জীব তার কর্ম অনুসারে বিশেষ প্রকার শরীর লাভ করে। এই জড় জগতে বিশেষ শরীরের মাধ্যমে যে জড়সুখ ভোগ হয় তার ভিত্তি হচ্ছে মৈথুন—*যন্মৈথুনাদিগৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছম্।* এই মৈথুনসুখের জন্যই কেবল সমগ্র জগৎ কঠোর পরিশ্রম করছে। মৈথুনসুখের জন্য এবং জড়-জাগতিক জীবনের পদমর্যাদা বজায় রাখার জন্য মানুষকে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, এবং এই প্রকার কার্যকলাপের ফলে তাকে আর একটি জড় শরীরের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর অসুর-বন্ধুদের সেই কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ করেছিলেন। অসুরেরা সাধারণত বুঝতে পারে না যে, তথাকথিত মৈথুনসুখ কঠোর পরিশ্রমের ভিত্তিতে লাভ হয়।

শ্লোক ৪৭

কর্মাণ্যারভতে দেহী দেহেনাত্মানুবর্তিনা ।
কর্মভিস্তনুতে দেহমুভয়ং ত্ববিবেকতঃ ॥ ৪৭ ॥

কর্মাণি—সকাম কর্ম; **আরভতে**—শুরু হয়; **দেহী**—দেহধারী জীব; **দেহেন**—সেই দেহের দ্বারা; **আত্ম-অনুবর্তিনা**—তার বাসনা এবং পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে যা লাভ হয়; **কর্মভিঃ**—এই প্রকার কর্মের দ্বারা; **তনুতে**—বিস্তার করে; **দেহম্**—আর একটি শরীর; **উভয়ম্**—উভয়েই; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অবিবেকতঃ**—অজ্ঞানবশত।

অনুবাদ

দেহধারী জীবের পূর্বকৃত কর্মের ফল এই জীবনে সমাপ্ত হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেছে। জীব তার পূর্বকৃত কর্ম অনুসারে এক শরীর প্রাপ্ত হয়, এবং সেই শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত

কর্মের প্রভাবে সে আর একটি শরীর তৈরি করে। এইভাবে সে তার অজ্ঞানের ফলে, জন্ম-মৃত্যুর মাধ্যমে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হয়।

তাৎপর্য

মনুষ্য শরীর ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীরের মাধ্যমে জীবের বিবর্তন প্রকৃতির নিয়মের দ্বারা আপনা থেকেই পরিচালিত হয়। অর্থাৎ, প্রকৃতির নিয়মে (*প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি*) জীব নিম্নস্তরের যোনি থেকে ক্রমশ উচ্চতর যোনিতে উন্নীত হয়ে অবশেষে মনুষ্য-যোনি প্রাপ্ত হয়। তাই, বিকশিত চেতনা লাভ করার ফলে, মানুষের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে জীবের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং কেন যে জীবকে জড় দেহ ধারণ করতে হয়, সেই সম্বন্ধে অবগত হওয়া। প্রকৃতি তাকে সেই সুযোগটি দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যদি একটি পশুর মতো আচরণ করে, তা হলে মনুষ্য-জীবন পেয়ে কি লাভ? তাই মানুষের কর্তব্য, এই জীবনেই জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সেই অনুসারে আচরণ করা। শ্রীগুরুদেব এবং শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করে যথেষ্ট বুদ্ধিমান হতে হবে। মনুষ্য-জীবন লাভ করার পর আর মূর্খ এবং অজ্ঞান থাকা উচিত নয়, পক্ষান্তরে নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা উচিত। এই প্রশ্নকে বলা হয় *অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা*। মানুষের মনে অনেক প্রশ্নের উদয় হয়, এবং বিভিন্ন দার্শনিকেরা তাদের মনোধর্মের ভিত্তিতে সেগুলি বিবেচনা করেছে এবং উত্তর দিয়েছে। কিন্তু এটিই মুক্তি লাভের পন্থা নয়। বৈদিক নির্দেশ হচ্ছে, *তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ*—জীবনের সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে মানুষকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ করতে হবে। *তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্*—জড়-জাগতিক অস্তিত্বের সমস্যার সমাধান করতে যদি কেউ ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী হয়, তা হলে তাকে সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর কাছে ঐকান্তিকভাবে প্রশ্ন করতে হবে।

তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া ।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

"সদ্‌গুরুর শরণাগত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করার চেষ্টা কর। বিনম্র চিত্তে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর এবং অকৃত্রিম সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট কর; তা হলে সেই তত্ত্বদ্রষ্টা পুরুষ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দান করবেন।" (*ভগবদ্‌গীতা* ৪/৩৪) ঐকান্তিকভাবে নিজেকে সদ্‌গুরুর চরণে সমর্পণ করে (*প্রণিপাতেন*) এবং তাঁর সেবা করে শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হতে হয়। বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য সদ্‌গুরুর কাছে জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। সদ্‌গুরু এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন, কারণ

তিনি বাস্তব সত্য দর্শন করেছেন। এমন কি আমাদের সাধারণ কার্যকলাপেও আমরা প্রথমে লাভক্ষতির বিচার করে তারপর কার্য করি। তেমনই, বুদ্ধিমান মানুষ জড় জীবনের সমগ্র প্রক্রিয়ার বিচার করে তারপর সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসারে বুদ্ধিমত্তা সহকারে কর্ম করবেন।

শ্লোক ৪৮

তস্মাদর্থাশ্চ কামাশ্চ ধর্মাশ্চ যদপাশ্রয়াঃ ।
ভজতানীহয়াত্মানমনীহং হরিমীশ্বরম্ ॥ ৪৮ ॥

তস্মাৎ—অতএব; **অর্থাঃ**—অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের উচ্চাভিলাষ; **চ**—এবং; **কামাঃ**—ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের বাসনা; **চ**—ও; **ধর্মাঃ**—ধর্মের কর্তব্য; **চ**—এবং; **যৎ**—যাঁর উপর; **অপাশ্রয়াঃ**—আশ্রিত; **ভজত**—আরাধনা কর; **অনীহয়া**—সেই সম্বন্ধে বাসনা রহিত হয়ে; **আত্মানম্**—পরমাত্মাকে; **অনীহম্**—উদাসীন; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর।

অনুবাদ

পারমার্থিক উন্নতির চারটি বর্গ—ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ পরমেশ্বর ভগবানের উপর আশ্রিত। তাই হে বন্ধুগণ, ভগবদ্ভক্তের পদাঙ্ক অনুসরণ কর। কোন রকম কামনা না করে, ভগবানের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হয়ে, ভক্তি সহকারে সেই পরম আত্মা ভগবানের আরাধনা কর।

তাৎপর্য

এটিই বুদ্ধিমানের বাণী। সকলেরই জানা উচিত যে, জীবনের প্রতিটি অবস্থাতেই আমরা ভগবানের উপর নির্ভরশীল। তাই ধর্ম বলতে আমাদের সেই ধর্মই গ্রহণ করা উচিত যা প্রহ্লাদ মহারাজ গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছেন, এবং তা হচ্ছে—ভাগবত-ধর্ম। এটিই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ—*সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ*। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের শরণ গ্রহণ করার অর্থ ভাগবত-ধর্ম বা ভগবদ্ভক্তির বিধি-নিষেধ অনুসারে আচরণ করা। অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে, আমাদের নিষ্ঠা সহকারে কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা উচিত, কিন্তু সেই কর্মের ফলের জন্য সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের উপর নির্ভর করা উচিত। *কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন*—"তোমার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করার অধিকার রয়েছে, কিন্তু

সেই কর্মের ফলের উপর কোন অধিকার তোমার নেই।" মানুষের উচিত তার স্থিতি অনুসারে তার কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করা, কিন্তু সেই কর্মের ফলের জন্য সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করা উচিত। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন যে, কৃষ্ণভক্তির কর্তব্য অনুষ্ঠান করাই আমাদের একমাত্র বাসনা হওয়া উচিত। *কর্মমীমাংসা* দর্শনের সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে, নিষ্ঠা সহকারে কর্ম করলে তার ফল আপনা থেকেই আসবে, এই ধরনের অপসিদ্ধান্তের দ্বারা আমাদের কখনই বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। এই সিদ্ধান্ত সত্য নয়। কর্মের ফল চরমে নির্ভর করে ভগবানের ইচ্ছার উপর। তাই ভগবদ্ভক্তিতে ভক্ত সর্বতোভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করেন এবং নিষ্ঠা সহকারে তাঁর কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করেন। তাই প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর বন্ধুদের উপদেশ দিয়েছেন, সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপর নির্ভর করতে এবং ভক্তি সহকারে তাঁর আরাধনা করতে।

শ্লোক ৪৯

সর্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মেশ্বরঃ প্রিয়ঃ ।
ভূতৈর্মহদ্ভিঃ স্বকৃতৈঃ কৃতানাং জীবসংজ্ঞিতঃ ॥ ৪৯ ॥

সর্বেষাম্—সমস্ত; **অপি**—নিশ্চিতভাবে; **ভূতানাম্**—জীবের; **হরিঃ**—জীবের দুঃখ-দুর্দশা নিবৃত্তি সাধনকারী ভগবান; **আত্মা**—জীবনের আদি উৎস; **ঈশ্বরঃ**—পূর্ণ নিয়ন্তা; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **ভূতৈঃ**—পঞ্চভূতের দ্বারা; **মহদ্ভিঃ**—মহত্তত্ত্ব থেকে উদ্ভূত; **স্বকৃতৈঃ**—যিনি নিজের থেকেই প্রকাশিত হন; **কৃতানাম্**—সৃষ্ট; **জীব-সংজ্ঞিতঃ**—যেহেতু সমস্ত জীবেরা তাঁর তটস্থা শক্তি থেকে উদ্ভূত, তাই তিনিও জীব নামে পরিচিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবের আত্মস্বরূপ এবং অন্তর্যামী। সমস্ত জীবই চিন্ময় আত্মা এবং জড় দেহের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরই শক্তির প্রকাশ। তাই ভগবান পরম প্রিয় এবং পরম নিয়ন্তা।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান জড়া শক্তি, চিৎ-শক্তি এবং তটস্থা শক্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হন। তিনি এই জড় জগতে সমস্ত জীবের আদি উৎস, এবং সকলের হৃদয়ে

পরমাত্মারূপে বিরাজমান। যদিও জীব তার বিভিন্ন প্রকার শরীরের কারণ, তবুও সেই শরীর ভগবানের আদেশ অনুসারে জড়া প্রকৃতি প্রদান করে।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি ।
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

"হে অর্জুন, পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জীবকে দেহরূপ যন্ত্রে আরোহণ করিয়ে মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬১) জীবের শরীর ঠিক একটি যন্ত্র বা গাড়ির মতো, যাতে আরোহণ করে জীব তার বাসনা অনুসারে ভ্রমণ করার সুযোগ পায়। ভগবান হচ্ছেন জড় শরীর এবং তাঁর তটস্থা শক্তির বিস্তার আত্মার আদি কারণ। ভগবান সমস্ত জীবের প্রিয়তম। প্রহ্লাদ মহারাজ তাই তাঁর সহপাঠী দৈত্যনন্দনদের পুনরায় ভগবানের শরণাগত হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন।

শ্লোক ৫০

দেবোঽসুরো মনুষ্যো বা যক্ষো গন্ধর্ব এব বা ।
ভজন্ মুকুন্দচরণং স্বস্তিমান্ স্যাদ্ যথা বয়ম্ ॥ ৫০ ॥

দেবঃ—দেবতা; **অসুরঃ**—অসুর; **মনুষ্যঃ**—মানুষ; **বা**—অথবা; **যক্ষঃ**—যক্ষ; **গন্ধর্বঃ**—গন্ধর্ব; **এব**—বস্তুতপক্ষে; **বা**—অথবা; **ভজন্**—সেবা করে; **মুকুন্দ-চরণম্**—মুক্তিদাতা মুকুন্দ বা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের; **স্বস্তিমান্**—সর্ব-মঙ্গলময়; **স্যাৎ**—হয়; **যথা**—যেমন; **বয়ম্**—আমরা (প্রহ্লাদ মহারাজ)।

অনুবাদ

দেবতা, অসুর, মানুষ, যক্ষ, গন্ধর্ব অথবা এই জগতের যে কেউই যদি মুক্তিদাতা মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করেন, তা হলে তিনি ঠিক আমাদেরই মতো (প্রহ্লাদ মহারাজ আদি মহাজনদের মতো) পরম মঙ্গলময় স্থিতি লাভ করেন।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর বন্ধুদের ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণ হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব নির্বিশেষে প্রতিটি জীবেরই কর্তব্য মুকুন্দের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে পরম সৌভাগ্য লাভ করা।

শ্লোক ৫১-৫২

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ॥ ৫১ ॥
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্ বিড়ম্বনম্ ॥ ৫২ ॥

ন—না; **অলম্**—যথেষ্ট; **দ্বিজত্বম্**—সর্বতোভাবে যোগ্যতা অর্জন করে যথার্থ ব্রাহ্মণ হয়ে; **দেবত্বম্**—দেবতা হয়ে; **ঋষিত্বম্**—ঋষি হয়ে; **বা**—অথবা; **অসুরাত্মজাঃ**—হে অসুরনন্দনগণ; **প্রীণনায়**—প্রসন্নতা বিধানের জন্য; **মুকুন্দস্য**—ভগবান শ্রীমুকুন্দের; **ন বৃত্তম্**—ভাল আচরণ নয়; **ন**—না; **বহুজ্ঞতা**—পাণ্ডিত্য; **ন**—নয়; **দানম্**—দান; **ন তপঃ**—তপস্যা নয়; **ন**—না; **ইজ্যা**—পূজা; **ন**—না; **শৌচম্**—শুচিতা; **ন ব্রতানি**—ব্রত আচরণ নয়; **চ**—ও; **প্রীয়তে**—প্রসন্ন হয়; **অমলয়া**—নির্মল; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **অন্যৎ**—অন্য বস্তু; **বিড়ম্বনম্**—কেবল লোক দেখানো অভিনয় মাত্র।

অনুবাদ

হে অসুরনন্দনগণ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, সদাচার এবং পাণ্ডিত্যের দ্বারা ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। এই সমস্ত গুণগুলি ভগবানকে আনন্দ দান করে না। এমন কি দান, তপস্যা, যজ্ঞ, শৌচ, ব্রত ইত্যাদির দ্বারাও ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা যায় না। ভগবান কেবল অবিচল, ঐকান্তিক ভক্তির দ্বারাই প্রসন্ন হন। একনিষ্ঠ ভক্তি ব্যতীত অন্য সব কিছুই কেবল লোক দেখানো অভিনয় মাত্র।

তাৎপর্য

প্রহ্লাদ মহারাজ সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সর্বতোভাবে নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করার দ্বারা জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করা যায়। ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব ইত্যাদির দ্বারা ভগবৎ প্রেম বিকশিত করা যায় না, কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠা সহকারে ভগবানের সেবা করেন, তা হলে তাঁর কৃষ্ণভক্তি পূর্ণ হয়। সেই কথা *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) প্রতিপন্ন হয়েছে—

অপি চেৎসুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥

"অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্য ভক্তি সহকারে আমাকে ভজনা করে, তাকে সাধু বলে মনে করবে, কারণ তিনি যথার্থ মার্গে অবস্থিত।" শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম বিকশিত করাই জীবনের পরম সিদ্ধি। অন্যান্য পন্থাগুলি সেই সিদ্ধি লাভের সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম যদি বিকশিত না হয়, তা হলে সেই সমস্ত পন্থাগুলি কেবল সময়ের অপচয় মাত্র।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু যঃ ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥

"স্বীয় বৃত্তি অনুসারে বর্ণাশ্রম পালনরূপ স্বধর্ম অনুষ্ঠান করার ফলেও যদি পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ-কীর্তনে আসক্তির উদয় না হয়, তা হলে তা বৃথা শ্রম মাত্র।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/২/৮) সাফল্যের পরীক্ষা হচ্ছে ভগবানের প্রতি অনন্য ভক্তি।

শ্লোক ৫৩

ততো হরৌ ভগবতি ভক্তিং কুরুত দানবাঃ ।
আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সর্বভূতাত্মনীশ্বরে ॥ ৫৩ ॥

ততঃ—অতএব; **হরৌ**—ভগবান শ্রীহরি; **ভগবতি**—পরমেশ্বর ভগবান; **ভক্তিম্**—ভক্তি; **কুরুত**—অনুষ্ঠান কর; **দানবাঃ**—হে দৈত্যনন্দনগণ; **আত্ম-ঔপম্যেন**—নিজের মতো; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **সর্ব-ভূত-আত্মনি**—যিনি সমস্ত জীবের আত্মা এবং পরমাত্মারূপে অবস্থিত; **ঈশ্বরে**—পরমেশ্বর ভগবানকে।

অনুবাদ

হে অসুরনন্দন বন্ধুগণ, যেভাবে তোমরা নিজেদের ভালবাস এবং নিজেদের দেখাশোনা কর, ঠিক সেইভাবে, সমস্ত জীবের অন্তর্যামীরূপে যিনি সর্বত্র বিরাজমান, সেই ভগবানের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর সেবা কর।

তাৎপর্য

আত্মৌপম্যেন শব্দটির অর্থ আত্মসদৃশ অন্যদের দর্শন করা। অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তা সহকারে মানুষ স্থির সিদ্ধান্ত করতে পারে যে, ভগবদ্ভক্তি বিনা, কৃষ্ণভাবনামৃত বিনা কখনও সুখী হওয়া যায় না। তাই সমস্ত ভক্তের কর্তব্য হচ্ছে সারা পৃথিবী জুড়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করা, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতীত সমস্ত জীব এই জড় জগতে

দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। কৃষ্ণভক্তির প্রচারই সর্বশ্রেষ্ঠ জনকল্যাণ কার্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই কৃষ্ণভক্তিকে পরোপকার বলে বর্ণনা করেছেন। ভারতবর্ষে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন, তাঁদের উপর এই পরোপকারের দায়িত্ব বিশেষভাবে অর্পণ করা হয়েছে।

ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ।
জন্ম সার্থক করি' কর পর-উপকার ॥

(*চৈঃ চঃ আদি* ৯/৪১)

কৃষ্ণভক্তির অভাবে সারা জগৎ দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করছে। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভারতবর্ষে যারা মনুষ্যজন্ম লাভ করেছেন তাঁদের সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, কৃষ্ণভক্তি অবলম্বন করে তাঁদের জীবন সার্থক করতে এবং তারপর এই কৃষ্ণভাবনার অমৃত সারা পৃথিবী জুড়ে বিতরণ করতে, যাতে কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে অন্যেরাও সুখী হতে পারে।

শ্লোক ৫৪

দৈতেয়া যক্ষরক্ষাংসি স্ত্রিয়ঃ শূদ্রা ব্রজৌকসঃ ।
খগা মৃগাঃ পাপজীবাঃ সন্তি হ্যচ্যুততাং গতাঃ ॥ ৫৪ ॥

দৈতেয়াঃ—হে দৈত্যগণ; **যক্ষ-রক্ষাংসি**—যক্ষ এবং রাক্ষসগণ; **স্ত্রিয়ঃ**—স্ত্রীগণ; **শূদ্রাঃ**—শ্রমিক শ্রেণী; **ব্রজ-ওকসঃ**—গ্রামের গোপগণ; **খগাঃ**—পক্ষীগণ; **মৃগাঃ**—পশুগণ; **পাপজীবাঃ**—পাপী জীব; **সন্তি**—হতে পারে; **হি**—নিশ্চিতভাবে; **অচ্যুততাম্**—অচ্যুত ভগবানের গুণাবলী; **গতাঃ**—প্রাপ্ত।

অনুবাদ

হে দৈত্যনন্দন বন্ধুগণ! যক্ষ, রাক্ষস, নির্বোধ স্ত্রী, শূদ্র, গোপ, পক্ষী, পশু এবং পাপী জীবেরাও কেবলমাত্র ভক্তিযোগের পন্থা অবলম্বন করার মাধ্যমে শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করে অমৃতত্ব প্রাপ্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

ভক্তদের অচ্যুতগোত্র বা ভগবানের বংশোদ্ভূত বলে বর্ণনা করা হয়। ভগবানকে বলা হয় অচ্যুত, যেমন *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে, *সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়*

মেঽচ্যুত। ভগবান এই জড় জগতে অচ্যুত, কারণ তিনি হচ্ছেন পরম চিন্ময় পুরুষ। তেমনই, ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবেরাও অচ্যুত হতে পারে। প্রহ্লাদ মহারাজের মাতা যদিও ছিলেন একজন বদ্ধ জীব এবং এক দৈত্যের পত্নী, তবুও তিনি অচ্যুতগোত্রে উন্নীত হয়েছিলেন। এমন কি যক্ষ, রাক্ষস, স্ত্রী, শূদ্র, পক্ষী এবং নিম্নস্তরের অন্যান্য পশুরাও অচ্যুত গোত্রে উন্নীত হতে পারে—ভগবানের পরিবারভুক্ত হতে পারে। সেটিই হচ্ছে পরম সিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণের যেমন কখনও অধঃপতন হয় না, তেমনই আমরা যখন আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনা বা কৃষ্ণ-ভাবনামৃত পুনর্জাগরিত করি, তখন আমাদেরও আর এই জড় জগতে অধঃপতন হয় না। পরম অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের স্থিতি আমাদের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত, যিনি *ভগবদ্গীতায়* (৪/৯) বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" আমাদের বোঝা উচিত পরম অচ্যুত কে, কিভাবে তাঁর সঙ্গে আমরা সম্পর্কযুক্ত হতে পারি এবং কিভাবে আমরা তাঁর সেবা করতে পারি। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম সিদ্ধি। শ্রীল মধ্বাচার্য বলেছেন, *অচ্যুততাং চ্যুতিবর্জনম্*। *অচ্যুততাম্* শব্দটির প্রয়োগ তাঁদের সম্পর্কেই হয়ে থাকে, যাঁরা সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে সর্বদা বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন এবং এই জড় জগতে যাঁদের কখনও অধঃপতন হয় না।

শ্লোক ৫৫

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসঃ স্বার্থঃ পরঃ স্মৃতঃ ।
একান্তভক্তির্গোবিন্দে যৎ সর্বত্র তদীক্ষণম্ ॥ ৫৫ ॥

এতাবান্—এতখানি; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **লোকে অস্মিন্**—এই জড় জগতে; **পুংসঃ**—জীবের; **স্ব-অর্থঃ**—প্রকৃত স্বার্থ; **পরঃ**—চিন্ময়; **স্মৃতঃ**—মনে করা হয়; **একান্ত-ভক্তিঃ**—ঐকান্তিক ভক্তি; **গোবিন্দে**—গোবিন্দের প্রতি; **যৎ**—যা; **সর্বত্র**—সর্বত্র; **তৎ-ঈক্ষণম্**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক দর্শন করে।

অনুবাদ

এই জগতে সর্বকারণের পরম কারণ গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মের সেবা করা এবং সর্বত্র তাঁকে দর্শন করাই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। এটিই মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য, যা সমস্ত শাস্ত্রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তাৎপর্য

এই শ্লোকে *সর্বত্র তদীক্ষণম্* পদটি ভগবদ্ভক্তির পরম সিদ্ধির বর্ণনা করেছে, যে স্তরে গোবিন্দের কার্যকলাপের পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু দর্শন হয়। এই অতি উন্নত স্তরের মহাভাগবত কখনও গোবিন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত কোন কিছু দর্শন করেন না।

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥

"মহা ভাগবত অবশ্যই স্থাবর এবং জঙ্গম দর্শন করেন, কিন্তু তিনি তাদের রূপ দর্শন করেন না, পক্ষান্তরে তিনি সর্বত্র ভগবানেরই রূপের প্রকাশ দর্শন করেন।" (*চৈঃ চঃ মধ্য* ৮/২৭৪) এই জড় জগতেও ভগবদ্ভক্ত বস্তুর জড় প্রকাশ দর্শন করেন না; পক্ষান্তরে তিনি সর্বত্রই গোবিন্দকে দর্শন করেন। তিনি যখন একটি বৃক্ষ বা একজন মানুষকে দর্শন করেন, তখন তিনি গোবিন্দের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের দর্শন করেন। *গোবিন্দমাদিপুরুষম্*—গোবিন্দ হচ্ছেন সব কিছুর আদি উৎস।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্ ॥

"শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর আর এক নাম গোবিন্দ, তিনিই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তাঁর দেহ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়। তিনি সব কিছুর আদি উৎস। তাঁর কোন উৎস নেই, কারণ তিনিই হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ।" (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/১) শুদ্ধ ভক্তের পরীক্ষা হচ্ছে যে, তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র গোবিন্দকে দর্শন করেন, এমন কি প্রতিটি পরমাণুতেও তিনি গোবিন্দকে দর্শন করেন (*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং*)। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের চিন্ময় দর্শন। তাই বলা হয়েছে—

নারায়ণময়ং ধীরাঃ পশ্যন্তি পরমার্থিনঃ ।
জগদ্ ধনময়ং লুব্ধাঃ কামুকাঃ কামিনীময়ম্ ॥

ভগবদ্ভক্ত সব কিছুই নারায়ণের সম্পর্কে দর্শন করেন (*নারায়ণময়ম্*)। সব কিছুই নারায়ণের শক্তির বিস্তার। ধনলোলুপ ব্যক্তি যেমন সারা জগৎকে ধনময় দর্শন

করে এবং কামুক যেমন সারা জগৎকে কামিনীময় দর্শন করে, তেমনই শুদ্ধ ভক্ত সব কিছুই নারায়ণময় দর্শন করেন। প্রহ্লাদ মহারাজের মতো শুদ্ধ ভক্ত পাথরের স্তম্ভেও নারায়ণকে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, কতকগুলি মূর্খ লোক দরিদ্র-নারায়ণ নামক যে একটি অপসিদ্ধান্ত প্রচার করেছে তা আমাদের স্বীকার করতে হবে। যিনি বস্তুতপক্ষে সর্বত্র নারায়ণকে দর্শন করেন, তিনি ধনী-দরিদ্রের ভেদ দর্শন করেন না। তিনি দরিদ্র-নারায়ণকে গ্রহণ করে ধনী নারায়ণকে বর্জন করেন না। সেটি ভগবদ্ভক্তের দর্শন নয়, পক্ষান্তরে সেটি বিষয়াসক্ত ব্যক্তিদের ভ্রান্ত দর্শন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের 'প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে কি শিখেছিল' নামক সপ্তম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।